ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর অবস্থা ও কর্ত্তব্য

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর অবস্থা ও কর্ত্তব্য

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

প্রকাশক—
শ্রীকিরণকুমার রায়
৩০, দেবদ্বার ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, কলিকাতা

১৩৪৫

মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস লিঃ, ৯০, লোয়ার সারকুলার রোড,
ইণ্টালী, কলিকাতা হইতে শ্রীপুলিনবিহারী সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রবেশিকা

কোন গ্রন্থ পাঠ করিতে হইলে লেখক কোন্ অবস্থায় মনে কোন্ ভাব লইয়া তাহা লিখিয়াছেন, তাহা জানা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, কারণ তাহা জানা না থাকিলে সর্ব্বতোভাবে বক্তব্যের মর্ম্মোদ্ধার করা সম্ভব হয় না। ইহা ছাড়া লেখক কোন্ শ্রেণীর মানুষ, তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধি কতখানি, তাঁহার চরিত্র কিরূপ, তাহাও জানিবার প্রয়োজন' হয়, কারণ তাহা জানা না থাকিলে গ্রন্থের বক্তব্য অবিচারিত ভাবে গ্রহণীয় অথবা বিচারপূর্ব্বক উহার অংশ-বিশেষ গ্রহণ অথবা বর্জ্জন করিতে হইবে, তাহা স্থির করা সম্ভব হয় না।

যে সমস্ত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের কোন মঙ্গলের জন্য লিখিত হয়, তাহা সর্ব্বনিয়ন্তার কোন না কোন রূপ, অথবা বিকাশ, অথবা উন্মেষকে স্মরণ করিয়া আরম্ভ করা সুধীগণের চিরাচরিত প্রথা। আমার সে সাহস নাই, কারণ আমার জিহ্বার অপবিত্রতা আমি এখনও বিস্মৃত হইতে পারি নাই।

মানুষের প্রত্যক্ষ দেবতা তিনটি—পিতা, মাতা ও বায়ু। আমি যথাসময়ে ঐ তিনটির কোনটিকেই চিনিতে পারি নাই। পরন্তু, বিদ্রোহভাবে মত্ততাবশতঃ অধঃপতনের শেষ সীমায় উপনীত হইয়া তাঁহাদিগের দান—এই শরীর ও দেহকে অহরহঃ নানা রকমে নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। তখন কোন শক্তির প্ররোচনায় ভাবান্তর উপস্থিত হয়। সেই শক্তির বিদ্যমানতা অস্পষ্ট ভাবে সর্ব্বদাই অনুভব করিতেছি বটে, কিন্তু এখনও তাহা সম্যক্ ভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারি নাই। সেই অজানা শক্তির

বলে চাহিয়া দেখি যে, আধুনিক মানব-সমাজের প্রায় প্রত্যেকেই আমারই মত হতভাগ্য। প্রায় প্রত্যেকেই আমারই মত অশিক্ষায় ও কুশিক্ষায় জর্জ্জরিত, অথচ আমারই মত দাম্ভিক। আমারই মত প্রত্যেকে অর্থাভাবে, অস্বাস্থ্যে, অশান্তিতে, অসন্তুষ্টিতে, অকালবার্দ্ধক্যে এবং প্রিয় ও প্রিয়াগণের অকাল-মৃত্যুতে সন্তপ্ত। অথচ তাহা বুঝিয়াও কেহ বুঝেন না।

ঐ অজানা শক্তির কৃপাতেই চাহিয়া, আরও দেখি যে, মানুষের এই অবস্থার আরোগ্য সাধন করা কষ্টসাধ্য বটে, কিন্তু অসাধ্য নহে। উহার আরোগ্য সাধন করিবার সঙ্কেত ভারতীয় ঋষি-প্রণীত দর্শন, মীমাংসা ও বেদে অতি স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কেহ যেন আমার এই কথায় বুঝেন না যে, আমি ঋষিগণের দর্শন, মীমাংসা ও বেদের সমগ্র ভাগ সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছি। উহার অতীব সামান্য অংশই আমার উপলব্ধি-যোগ্য হইয়াছে এবং তাহাতেই আমি বুঝিয়াছি যে, মানুষ যতই পতিত হউক না কেন, তাহার সর্ব্বতোভাবে উদ্ধারের উপায় আছে। রত্নাকর দস্যুও বাল্মীকি মুনি হইতে পারে। সর্ব্ব রকমের পতিতের সর্ব্বতোভাবে উদ্ধার করিবার মন্ত্র একমাত্র ভারতীয় ঋষিগণ তাঁহাদিগের প্রণীত তিন ভাষায় (সংস্কৃত, আরবী ও হিব্রু) লিখিত বিবিধ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ইহা ছাড়া আর কোন ভাষায় উহা লিখিত হয় নাই এবং সর্ব্বতোভাবে লিখিত হইতে পারে না।

সর্ব্ব রকমের পতিতকে সর্ব্বতোভাবে উদ্ধার করিবার সঙ্কেত যে-তিনটি ভাষায় লিখিত আছে, সেই তিনটি ভাষা মানুষ স্মরণাতীত কালহইতে বিস্মৃত হইয়াছে। এমন কি, সুপ্রসিদ্ধ ভট্ট ও আচার্য্যগণ পর্য্যন্ত ঐ তিনটি ভাষা সম্যক্ ভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই। উহা মানুষ বিস্মৃত হইয়াছে বলিয়াই এক্ষণে মানুষ এতাদৃশ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। স্মরণাতীত কাল

হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত এই বিস্তৃত সময়ের মধ্যে কালের প্ররোচনায় ঋষিগণের ঐ কথাগুলি কেবল মাত্র যথাক্রমে শাক্যসিংহ, যীশুখৃষ্ট ও নবী মহম্মদের প্রাণে উদ্ভাসিত হইয়াছিল এবং তাঁহারা কিছু দিনের জন্য সমগ্র মানব-সমাজের পতিতগণকে উদ্ধার করিবার সঙ্কেত শুনাইয়া গিয়াছিলেন।

যে অজানা শক্তির কৃপায় আমার মনে উপরোক্ত কথাগুলি স্থান পাইয়াছে, তাঁহারই প্ররোচনায় তদবধি আমার কলম চলিতেছে। সময় সময় ইচ্ছা হইলেও আমি উহা বন্ধ করিতে পারিতেছি না। অনেকের প্রাণে যে আমার লেখনীপ্রসূত কথায় কষ্ট হইতেছে, তাহা সম্পূর্ণ ভাবে আমার অবিদিত নহে। কিন্তু কি করিব, আমি অনন্যোপায়।

যাঁহারা আমার পরিচয় বিদিত আছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, আমি একজন অৰ্দ্ধ-শিক্ষিত বৈশ্য-ব্যবসায়ী। আমার চরিত্র হয়ত অনেকেই জানেন না। কিন্তু তাহাতে গৌরব করিবার কিছুই নাই। পরন্তু আমাকে কাম-ক্রোধপরবশ শিশ্নোদরপরায়ণ অতীব ঘৃণিত চরিত্রের মানুষ বলিলেও বলা যাইতে পারে।

বিদ্যা, বুদ্ধি ও চরিত্রবল আমার নাই। আমার আছে কেবল-মাত্র প্রাণের বেদনা ও অনুতাপের মর্ম্মান্তিক গ্লানি। আমাকে ক্ষমা করিয়া আমার কথাগুলি সুধীবর্গ পাঠ করেন ও বিচার করেন—ইহাই আমি চাহি। অন্ধভাবে উহার কোনটি কেহ গ্রহণ করেন, ইহা আমি চাহি না।

আমার কথাগুলি সম্যক্‌ভাবে সুধীবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিলে আমার শ্রম সার্থক হইবে।

নিবেদক—

বংশহিসাবে ভট্টাচার্য্যোপাধিধারী

শ্রীসচ্চিদানন্দ

প্রকাশকের নিবেদন

এই গ্রন্থের বক্তব্য মাসিক বঙ্গশ্রীর ১৩৪৫ সনের আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছে।

যে মহান্ উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া ইহা লিখিত হইয়াছে, তাহা এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। কেবলমাত্র মাসিক পত্রিকার মধ্যে উহা নিহিত থাকিলে আমাদিগের এই প্রযত্ন বিস্মৃতির গর্ভে লুক্কায়িত হইয়া যাইতে পারে, তাহা মনে করিয়া আমরা উহা গ্রন্থাকারে পুনর্মুদ্রিত করিলাম। গ্রন্থের সমস্ত বক্তব্য পাঠ করিবার মত ধৈর্য্য ও অবসর যাঁহাদের নাই, তাঁহাদিগের জন্য ইহার শেষভাগে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য সন্নিবেশিত হইয়াছে।

শিক্ষিত সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিলে আমাদিগের শ্রম ও অর্থব্যয়ের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে করিব। ইতি

প্রকাশক

শ্রীকিরণকুমার রায়

ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর অবস্থা ও কর্ত্তব্য

ভারতবর্ষের ও ভারতবাসীর অতীত চিত্র

ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী যে রাস্তায় চলিয়াছে, তাহাতে তাহাদিগের উন্নতি হইতেছে অথবা অবনতি হইতেছে, তৎসম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে, অতীত কালে ভারতবর্ষের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার চিত্র সর্ব্বপ্রথমে উদ্ঘাটন করিতে হইবে। কত সহস্র বৎসর লইয়া যে ভারতবর্ষের অতীত, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। উহা বলা যায় না বটে, কিন্তু যে সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থ এখানে প্রণীত হইয়াছিল এবং তাহার মধ্যে যে সমস্ত গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে, তাহার দিকে লক্ষ্য করিলে ইহার অতীত যে বহু সহস্র বৎসর-ব্যাপী, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ বিদ্যমান থাকে না।

ভারতবর্ষের যে প্রাচীন গ্রন্থসমূহ এখনও বিদ্যমান আছে, তাহার দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, উহার কতকগুলি ঋষি ও মুনি প্রণীত, কতক-গুলি "দেব" প্রণীত, কতকগুলি "রাজ" ও "সিংহ" প্রণীত, কতকগুলি "ভট্ট" প্রণীত, কতকগুলি "আচার্য্য" প্রণীত, কতকগুলি "দীক্ষিত" প্রণীত, কতকগুলি "সূরি" প্রণীত, কতকগুলি "স্বামী" প্রণীত, কতকগুলি "ভট্টাচার্য্য" প্রণীত, আর কতকগুলি "অবধূত", "তর্করত্ন", "সাংখ্যরত্ন", "তর্কাচার্য্য", "সাংখ্যতীর্থ" প্রভৃতি আধুনিক উপাধিবিশিষ্ট মানুষের প্রণীত। এই গ্রন্থ-গুলির ভাষা, রচনা-পদ্ধতি ও বক্তব্য বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করিলে ইহাদিগকে

সাধারণতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ইহাদিগের মধ্যে যেগুলি ঋষি ও মুনি প্রণীত, তাহা সাধারণতঃ প্রথম শ্রেণীর; যেগুলি "দেব", "রাজ" ও "সিংহ" প্রণীত, তাহা সাধারণতঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর; যেগুলি "ভট্ট," "আচার্য্য," "দীক্ষিত" ও "সূরি" প্রণীত, তাহা সাধারণতঃ তৃতীয় শ্রেণীর; আর যেগুলি "স্বামী" "ভট্টাচার্য্য", "অবধূত," "তর্করত্ন", "সাংখ্য-রত্ন", "তর্কাচার্য্য", "সাংখ্যতীর্থ" প্রভৃতি আধুনিক উপাধিবিশিষ্ট মানুষের প্রণীত, তাহা সাধারণতঃ চতুর্থ শ্রেণীর। এই চারি শ্রেণীর গ্রন্থ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিন্তা করিয়া অধ্যয়ন করিলে দেখা যাইবে যে, ইহার প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যেই ব্যাকরণ, শব্দতত্ত্ব, শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, বেদ, মীমাংসা, দর্শন, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, চিকিৎসা, অলঙ্কার, ছন্দঃ, গণিত, অর্থ-নীতি, রাজনীতি, বাণিজ্য-নীতি, কৃষি-নীতি, শিল্প, গৃহনির্ম্মাণ-প্রণালী, যান-বাহন-নির্ম্মাণ-প্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে অল্পাধিক আলোচনা রহিয়াছে। ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে, এই চারি শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যেই উপরোক্ত ব্যাকরণ প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়ের আলোচনা অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু ঐ আলোচনার ভাষা, রচনা-পদ্ধতি ও ভঙ্গী চারি শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে প্রায়শঃ সর্ব্বতোভাবে পৃথক্ পৃথক্।

ঋষি ও মুনিগণ যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকখানির ভাষা যেরূপ প্রাঞ্জল, সেইরূপ বক্তব্য বিষয়ও সম্পূর্ণ মৌলিক। উহার কোনখানিতেই কোনরূপ মন্তব্য প্রচারের প্রচেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রত্যেকখানিতেই কোন না কোন বিষয়-সম্বন্ধীয় সত্যোদ্ঘাটনের প্রযত্ন এবং কি করিলে ঐ সত্যসমূহ প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে, তাহার নির্দ্দেশ দেখা যাইবে। এই গ্রন্থগুলির রচনা-পদ্ধতি ও বক্তব্য বিষয় এত সুস্পষ্ট যে, ঋষি ও মুনিদিগের ভাষায় যথাযথ ভাবে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে ইহাঁদের প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ জীবনের ৮।১০ বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ ভাবে পাঠ করিয়া উঠা সম্ভব হয় এবং তৎসাহায্যে কি করিয়া মানুষ অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অসন্তুষ্টি, অশান্তি, অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা পাইতে পারে, তদ্বিষয়ক জ্ঞান

সম্পূর্ণ ভাবে লাভ করিতে সক্ষম হওয়া যায়। ঋষি ও মুনিগণ প্রণীত গ্রন্থসমূহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাঁদের কোন গ্রন্থই কেবল মাত্র কোন ব্যক্তি, জীব অথবা দেশবিশেষের উন্নতি কি করিয়া হইতে পারে, তাহার আলোচনায় সীমাবদ্ধ নহে। পরন্তু, প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক মানুষের ও প্রত্যেক জীবের অর্থাভাব, অস্বাস্থ্য, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু কি করিলে বিদূরিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ক কোন না কোন আলোচনা তাঁহাদিগের প্রত্যেক গ্রন্থখানিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ঋষি ও মুনি-প্রণীত গ্রন্থসমূহ তলাইয়া অধ্যয়ন করিতে পারিলে দেখা যায় যে, উহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন বিষয়ে কোন মতপার্থক্য বিদ্যমান নাই, পরন্তু উহারা সর্ব্বতোভাবে একমতাবলম্বী।

"দেব", "রাজ" ও "সিংহ" উপাধিধারী মানুষগুলি যে সমস্ত গ্রন্থ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার কোনখানিরই আলোচ্য বিষয় সম্পূর্ণভাবে মৌলিক নহে এবং উহার কোনখানিই কোন না কোন মন্তব্য-প্রচারের প্রচেষ্টার দোষ হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত নহে। ইহাঁদের প্রণীত প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থখানিই ঋষি ও মুনিদিগের প্রণীত গ্রন্থসমূহের বিষয়কে ভিত্তি করিয়া লিখিত। ঋষি ও মুনিগণ তাঁহাদিগের প্রণীত গ্রন্থসমূহে সত্যোদ্ঘাটন ও সত্য প্রত্যক্ষ করাইবার জন্য যে সমস্ত ক্রিয়া-বিধি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সেই সমস্ত ক্রিয়া-বিধির কোন বিবৃতি "দেব", "রাজ" ও "সিংহ" প্রণীত কোন গ্রন্থে প্রায়শঃ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু এই সমস্ত গ্রন্থে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায়, তাহা প্রায়শঃ ঋষিদিগের সিদ্ধান্তের বিরোধী নহে। এই গ্রন্থগুলির বক্তব্য ঋষিদিগের সিদ্ধান্তের বিরোধী না হইলেও উহা এত অসম্পূর্ণ ও শৃঙ্খলাবর্জ্জিত যে, উহার কোনখানি হইতেই মনুষ্যের বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয় কোন কার্য্য-পদ্ধতিই প্রয়োগানুযায়ী ভাবে পাওয়া যায় না এবং তাহার ফলে কি করিয়া মানুষ অর্থ, স্বাস্থ্য, শান্তি, সন্তুষ্টি, দীর্ঘ-যৌবন ও দীর্ঘজীবনের অভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহা ঐ সমস্ত গ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে অধ্যয়ন করিয়াও শিক্ষা করা সম্ভব হয় না।

"দেব", "রাজ" ও "সিংহ" উপাধিধারী মানুষগুলির লিখিত গ্রন্থসমূহের ভাষা ও রচনাপদ্ধতি ঋষি ও মুনি-প্রণীত গ্রন্থসমূহের ভাষা ও রচনাপদ্ধতির ন্যায় প্রাঞ্জল ও শৃঙ্খলামূলক না হইলেও অপর দুই শ্রেণীর গ্রন্থের তুলনায় অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল ও শৃঙ্খলামূলক। এই গ্রন্থগুলির অপর বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রায়শঃ কোন মতপার্থক্য দেখা যায় না।

তৃতীয় শ্রেণীর যে গ্রন্থগুলি "ভট্ট", "আচার্য্য", "সূরি" ও "দীক্ষিত" উপাধিধারী পণ্ডিতগণের দ্বারা লিখিত, তাহাদেরও আলোচ্য বিষয়ে কোন মৌলিকতা পরিলক্ষিত হয় না। এই গ্রন্থগুলিও ঋষি ও মুনিগণের আলোচ্য বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রায়শঃ মূলতঃ উঁহাদের গ্রন্থ-সমূহের ব্যাখ্যা-স্বরূপ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যদিও "ভট্ট", "আচার্য্য", "সূরি" ও "দীক্ষিত"গণ ঋষিগণের গ্রন্থসমূহের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তথাপি ইহাঁরা কেহই প্রায়শঃ মূলগ্রন্থগুলির কথা পরিষ্কার ও অভ্রান্তভাবে বিবৃত করিতে সক্ষম হন নাই। অধিকন্তু, ইহাঁরা ঋষি ও মুনিগণের গ্রন্থ-সমূহের ব্যাখ্যাকল্পে যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই ঋষিগণের মতবাদের বিরোধী। ইহাঁদিগের বিবৃত মতবাদসমূহের পর-স্পরের মধ্যে প্রায়শঃ কোন সামঞ্জস্য অথবা ঐক্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থগুলির ভাষা ও রচনাপদ্ধতির দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, উহা একদিকে যেরূপ অপ্রাঞ্জল ও দুরূহ, অন্যদিকে আবার ইহার মধ্যে অধিকাংশ গ্রন্থেই কোন শৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয় না। ইহাঁদের মতবাদ ও কার্য্যপদ্ধতিসমূহের মধ্যে প্রায়শঃ কোন যুক্তি-যুক্ততা অথবা প্রয়োগ-যোগ্যতা পরিলক্ষিত হয় না।

বাস্তব জীবনের সাধারণ সমস্যাসমূহ কি করিয়া দূর করিতে হয়, তাহার কোন কথা এই গ্রন্থগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না। উহা পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু তথাপি ইহাদের কথার মধ্যে যে বিচারপটুতার নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহার দিকে লক্ষ্য করিলে, প্রণেতাগণকে তর্ক-পটু পণ্ডিত বলিতে বাধ্য হইতে হয়।

যে গ্রন্থগুলি "স্বামী", "ভট্টাচার্য্য", "অবধূত", "তর্করত্ন", "সাংখ্যরত্ন", "তর্কাচার্য্য", "সাংখ্যতীর্থ" প্রভৃতি আধুনিক উপাধিধারী মানুষের দ্বারা লিখিত, সেই গ্রন্থসমূহ পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, উহাদের মধ্যে প্রায়শঃ গ্রন্থকারগণের পাণ্ডিত্য-প্রকাশের চেষ্টার চিহ্ন বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু ঐ গ্রন্থকারগণ যে বস্তুতঃ অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট দাম্ভিক মানুষ, তাহার নিদর্শনও ঐ গ্রন্থগুলির প্রায় ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থগুলির বক্তব্য বিষয়ও ঋষি-মুনিগণের বক্তব্য বিষয়ের অনুরূপ।

অথচ, যে যুক্তি-জাল ও প্রয়োগ-যোগ্য কর্ম্ম-পদ্ধতির নির্দ্দেশ ঋষি ও মুনিগণের গ্রন্থসমূহের বৈশিষ্ট্য, সেই যুক্তি-জাল ও প্রয়োগযোগ্য কর্ম্ম-পদ্ধতির নিদর্শন এই গ্রন্থগুলির কুত্রাপি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পরন্তু, ইহার প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থখানি পরস্পর-বিরোধী (self-contradictory) কথায় পরিপূর্ণ। এই শ্রেণীর প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থখানিতে নানাবিধ বিষয়ের আলোচনা উপস্থাপিত করা হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রায় প্রত্যেক আলোচনাটিতেই অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। সংক্ষেপতঃ, এই পুস্তকগুলিতে কেবলমাত্র কতকগুলি বাক্য-বিন্যাসের চাতুর্য্য বিদ্যমান আছে, অথচ ইহার কোনখানি হইতে কোন বিষয় সম্বন্ধে কোনরূপ সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা লাভ করা সম্ভব হয় না। ইহাদের ভাষা এবং রচনা-পদ্ধতি অত্যন্ত বিশৃঙ্খলামূলক। পরস্পরকে হীন প্রতিপন্ন করিয়া স্বকীয় পাণ্ডিত্যের প্রতিষ্ঠা করার প্রবৃত্তি ইহাদের প্রণেতাগণের সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য।

উপরোক্ত চারি শ্রেণীর গ্রন্থের তুলনামূলক বিচারে প্রবৃত্ত হইলে বলিতে হয় যে মানুষ কি করিয়া প্রকৃত 'মনুষ্য'-নামের যোগ্য হইয়া ব্যক্তিগতভাবে সর্ব্ববিধ অবস্থায় সর্ব্বতোভাবে সুখের আস্পদ হইতে পারে এবং কোন্ বিধিতে সমাজ সংগঠিত হইলে, প্রত্যেক মানুষটী অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়া একমাত্র স্বকীয় ব্যক্তিগত কর্ম্মকেই স্ব স্ব সুখ-দুঃখের জন্য দায়ী করিতে

বাধ্য হইতে পারে, তাহার আলোচনা ঋষি ও মুনিগণের প্রণীত প্রত্যেক গ্রন্থখানিকে সমলঙ্কৃত করিয়াছে।

"দেব", "রাজ" ও "সিংহ" উপাধিধারী মানুষগুলি যে গ্রন্থসমূহ লিখিয়াছেন এবং যাহাকে আমরা এই সন্দর্ভে দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহার প্রত্যেকখানিতেও ঋষি ও মুনিগণের আলোচ্য বিষয়সমূহই সমাবিষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু রচনা-পদ্ধতির দুষ্টতা ও সাধনার অভাব বশতঃ এই শ্রেণীর কোন গ্রন্থ হইতেই মানুষের ব্যক্তিগত ও সঙ্ঘগত সাধনার কোন সুস্পষ্ট বিধি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

"ভট্ট", "আচার্য্য", "সূরি" ও "দীক্ষিত"গণের প্রণীত যে সমস্ত গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে এবং যাহাকে আমরা তৃতীয় শ্রেণীর গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহার প্রত্যেক-খানির আলোচ্য বিষয়েও ঋষি এবং মুনিগণের আলোচ্য বিষয়ের সহিত অনুরূপতা রহিয়াছে। ইহাদের রচনা-পদ্ধতি দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থগুলির রচনা-পদ্ধতির তুলনায় অধিকতর দুষ্ট এবং ইহাদের মধ্যে প্রণেতাগণের সাধনার অভাবও অধিকতর মাত্রায় পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থগুলির কোন কোনখানির মধ্যে মানুষের ব্যক্তিগত ও সঙ্ঘগত সাধনার কথঞ্চিৎ অস্পষ্ট নির্দ্দেশ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর গ্রন্থগুলির কোনখানি হইতেই ঐ অস্পষ্ট নির্দ্দেশও পাওয়া যায় না। পরন্তু, এই গ্রন্থগুলির মধ্যে কতকগুলি পরস্পর-বিরোধী কথার ঝঙ্কার বিদ্যমান থাকায় মানুষ উহা পাঠ করিয়া অভিমানগ্রস্ত হইতে বাধ্য হইয়া পড়ে।

"স্বামী", "ভট্টাচার্য্য", "অবধূত", "তর্করত্ন" প্রভৃতি আধুনিক উপাধিধারি-গণের লিখিত গ্রন্থগুলির আলোচ্য বিষয়ও ঋষি এবং মুনিগণের গ্রন্থসমূহের আলোচ্য বিষয়ের অনুরূপ। এই গ্রন্থগুলির সিদ্ধান্ত প্রকারান্তরে ঋষিগণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ হওয়ায় মানুষের ব্যক্তিগত ও সঙ্ঘগত সাধনার নির্দ্দেশ

পাওয়া তো দূরের কথা, এই গ্রন্থগুলি পাঠ করিলে সাধারণতঃ পরোক্ষভাবে ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইতে হয়।

এই চারি শ্রেণীর গ্রন্থের কোন্ শ্রেণীর গ্রন্থ আগে এবং কোন্ শ্রেণীর গ্রন্থ পরে লিখিত হইয়াছিল, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, ইহাদের মধ্যে ঋষি ও মুনিগণের গ্রন্থ সর্ব্বাগ্রে লিখিত হইয়াছিল।

"দেব", "রাজ", ও "সিংহ" উপাধিধারিগণের গ্রন্থ ঋষি ও মুনিগণের গ্রন্থের পরবর্ত্তী।

"ভট্ট", "আচার্য্য", "সূরি" ও "দীক্ষিত"গণের গ্রন্থ, "দেব", "রাজ" ও "সিংহ" উপাধিধারিগণেরও পরবর্ত্তী।

"স্বামী", "ভট্টাচার্য্য", "অবধূত", "তর্করত্ন" প্রভৃতি আধুনিক উপাধিধারিগণ যে সমস্ত গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক।

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এই চারিশ্রেণীর গ্রন্থ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিলে ইহা বলিতে বাধ্য হইতে হয় যে, ভারতবর্ষে এমন একদিন ছিল, যখন ভারতবাসিগণের মধ্যে উচ্চতম চিন্তা ও উচ্চ সাধনা বিদ্যমান ছিল। এই চিন্তা ও সাধনার ফলে একদিন ভারতবাসী মানবসমাজকে সর্ব্ববিধ ব্যক্তিগত ও সঙ্ঘগত দুঃখ হইতে মুক্তির পন্থা দেখাইতে সক্ষম হইয়াছিল।

এই সময়ে মানুষের মধ্যে শ্রমজীবী (শূদ্র) ও বুদ্ধিজীবী (আর্য্য) বলিয়া এবং বুদ্ধিজীবিগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্য নামে শ্রেণী-বিভাগ ছিল বটে, কিন্তু, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মগত কোন শ্রেণী-বিভাগ বিদ্যমান ছিল না। তখন সমগ্র মানবসমাজে "মানবধর্ম্ম" নামক একটিমাত্র ধর্ম্ম বিদ্যমান ছিল। এই সময়ে মানুষের মধ্যে উপরোক্ত ভাবের শ্রেণী-বিভাগ বিদ্যমান ছিল বটে, কিন্তু কোন শ্রেণীর মানুষই স্বশ্রেণীকে অপর শ্রেণীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমান পোষণ করিতেন না। শ্রমজীবিগণ নিজদিগের শান্তি ও শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য বুদ্ধিজীবিগণের নায়কত্ব স্বীকার করিতেন বটে এবং বুদ্ধিজীবিগণও ঐ উদ্দেশ্যে শ্রমজীবিগণকে উপদেশের দ্বারা পরিচালনা

করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কখনও তজ্জন্য নিজদিগকে শ্রমজীবিগণের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া গর্বানুভব করিতেন না, অথবা তাঁহাদিগের প্রতি কোন ঘৃণা পোষণ করিতেন না। শৃঙ্খলিত জীবন-যাত্রা ও শিক্ষা-কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবার জন্য বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবী, অথবা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-নামক শ্রেণী-বিভাগ মানবসমাজের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান ছিল বটে, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ দলাদলি অথবা কলহের প্রবৃত্তি প্রায়শঃ দেখা যাইত না। যাঁহাদিগকে সমাজের নায়ক বলিয়া মানিয়া লওয়া হইত, তাঁহারা প্রায়শঃ নিঃস্বার্থভাবে সমগ্র সমাজের কল্যাণ-সাধনার কার্য্যে সর্ব্বদা প্রবৃত্ত থাকিতেন এবং সর্ব্বতোভাবে রাগ ও দ্বেষবিযুক্ত হইয়া, সর্ব্ববিধ জিদ্ ও উত্তেজনার কার্য্য হইতে নিজদিগকে দূরে রক্ষা করিতেন।

মানবসমাজের প্রত্যেক মানুষটীর পক্ষে কি করিয়া অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যুর হাত হইতে মুক্ত হইয়া অর্থ, স্বাস্থ্য, শান্তি ও সন্তুষ্টির প্রাচুর্য্য এবং দীর্ঘযৌবন ও দীর্ঘজীবন উপভোগ করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে, তাহার পন্থা আবিষ্কার করিবার উপযোগী সাধনায় এক শ্রেণীর লোক সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকিতেন। এই শ্রেণীর লোককে অপর শ্রেণীস্থ মানুষগুলি সমাজের নায়ক বলিয়া মানিয়া লইতেন। শিক্ষা ও সাধনায় ইঁহারা অপর তিন শ্রেণীর মানুষের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং অপর তিন শ্রেণীর মানুষ ইঁহাদিগকে প্রভুর ন্যায় মান্য করিতেন বটে, কিন্তু ইঁহারা নিজদিগকে কখনও অপর তিন শ্রেণীর প্রভু বলিয়া অভিমান পোষণ করিতেন না।

ইঁহাদের শিক্ষা ও সাধনার ফলে মানবসমাজের হিতার্থে যে সমস্ত সূত্র ও সঙ্কেত আবিষ্কৃত হইত, সেই সূত্র ও সঙ্কেতগুলি যাহাতে অপর তিন শ্রেণীর লোক শান্তিপূর্ণ ভাবে পালন করিতে পারে এবং করে, তাহার দায়িত্ব ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষগুলির উপর। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষগুলিকে অপর দুই শ্রেণীর মানুষ প্রভুর মত মান্য করিতেন বটে,

কিন্তু তাঁহারা নিজদিগকে কখনও অপর দুই শ্রেণীর মানুষের তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন না এবং অপর দুই শ্রেণীর মানুষও নিজদিগকে কোনরূপে হীনতর বলিয়া মনোভাব পোষণ করিতেন না।

মানবসমাজের হিতার্থে, প্রথম শ্রেণীর মানুষগুলির দ্বারা যে সমস্ত সূত্র ও সঙ্কেত আবিষ্কৃত হইত, তাহা যাহাতে শ্রমজীবিগণ শিক্ষা করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে পারে, তাহার দায়িত্বভার তৃতীয় শ্রেণীর মানুষের স্কন্ধে ন্যস্ত থাকিত। শ্রমজীবিগণ ইহাঁদিগের কথা গুরুর নির্দ্দেশের মত পালন করিয়া চলিতেন বটে, কিন্তু ইহাঁরা কখনও শ্রমজীবিগণকে কোনরূপ অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন না।

মানবসমাজের অর্থ, স্বাস্থ্য, শান্তি, সন্তুষ্টি, দীর্ঘযৌবন ও দীর্ঘ জীবন রক্ষা করিবার জন্য যে সমস্ত সূত্র ও সঙ্কেত প্রথম শ্রেণীর মানবের দ্বারা আবিষ্কৃত হইত এবং তাহার মধ্যে যে কার্য্যগুলি শারীরিক শ্রমসাধ্য বলিয়া পরিগণিত হইত, সেই কার্য্যগুলি সম্পাদনের ভার শ্রমজীবিগণের স্কন্ধে অর্পিত হইত। তাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীর মানুষের শিক্ষা ও নির্দ্দেশানুযায়ী উহা পালন করিতেন। এই শ্রমজীবিগণ কখনও নিজদিগকে প্রথম অথবা দ্বিতীয়, অথবা তৃতীয় শ্রেণীর সমকক্ষ বলিয়া মনে করিতেন না বটে এবং সর্ব্বদাই অবনতমস্তকে তাঁহাদিগের নির্দ্দেশ মান্য করিয়া চলিতেন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া কখনও নিজদিগকে অপদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতেন না এবং অপদার্থের মত নফরগিরিতে মত্ত হইয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন না।

ঋষি ও মুনিদিগের অভ্যুদয়-কালে মানবসমাজের হিতসাধনার্থে এতাদৃশ সূত্র ও সঙ্কেত আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়াই চারিশ্রেণীর মানুষের কোন শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকাল-বার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই এবং তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে সর্ব্বতোভাবের সখ্যভাব পরিলক্ষিত হইতে পারিত।

প্রত্যেক নদীটি যাহাতে বারমাস জলে পরিপূর্ণ থাকে, তজ্জন্য উহার গতি সর্ব্বতোভাবে অপ্রতিহত রাখিবার ব্যবস্থা করা হইত। ইহার জন্য

প্রায়শঃ স্থল-পথের রাস্তার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিতে হইত, কারণ স্থল-পথের রাস্তার পরিকল্পনা গৃহীত হইলে নদীর গতি প্রতিহত করা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। স্থল-পথের রাস্তার পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হইলে আপাতদৃষ্টিতে গমনাগমনের অসুবিধা হইতে পারে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ তখন যাতায়াতের কোনরূপ অসুবিধা ঘটিতে পারিত না, কারণ, সুগভীর নদী ও খালের সাহায্যে সর্ব্বজগদ্ব্যাপী জল-পথে রাস্তার ব্যবস্থা সাধন করা হইত এবং দ্রুতগামী জল-যান কিরূপ ভাবে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহার কৌশল তখনকার মানবসমাজ শিক্ষা করিতে পারিত। দেশের প্রত্যেক নদীটীতে যাহাতে বারমাস জল থাকে, তাহার দিকে তখন লক্ষ্য করা হইত বলিয়া দেশের প্রত্যেক খালটিও বারমাস জলে পরিপূর্ণ থাকিত এবং তাহার ফলে একদিকে যেরূপ দেশের জমীর সর্ব্বত্র সরসতা রক্ষা করা সম্ভব হইত, সেইরূপ আবার দেশের হাওয়াও অশুদ্ধি হইতে মুক্ত হইয়া অধিকতর স্নিগ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারিত। তখন, দেশের জমীর সরসতা, হাওয়ার শুদ্ধতা ও স্নিগ্ধতা সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা সম্ভব হইত বলিয়া শ্রমজীবিগণ বৎসরের মধ্যে পাঁচমাস মাত্র পরিশ্রম করিয়া সমগ্র সমাজের সারা বৎসরের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিতে পারিত এবং দেশের জলবায়ু প্রায়শঃ অস্বাস্থ্যকর হইতে পারিত না। এইরূপে সমগ্র সমাজের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল উৎপাদনের কার্য্য সম্পাদিত হইত। কাঁচামাল হইতে কুটীরশিল্পের সাহায্যে যাহাতে অনায়াসে ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যসমূহের (finished products) উৎপাদনের প্রাচুর্য্য রক্ষিত হয়, তাহার দিকেও যথেষ্ট মনোযোগ প্রদান করা হইত। যাহারা বৎসরের মধ্যে পাঁচ মাস মাত্র পরিশ্রম করিয়া সারা বৎসরের উপযোগী কাঁচামাল উৎপাদন করিতে পারিত, তাহারাই বাকী সাতমাস কুটীর-শিল্পের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। কুটীর-শিল্প-কার্য্য যন্ত্র শিল্প-কার্য্যের তুলনায় এক দিকে যেরূপ স্বাস্থ্যকর, সেইরূপ আবার কুটীর-শিল্প-জাত দ্রব্যও যন্ত্র-শিল্প-জাত দ্রব্যের তুলনায় মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে

অধিকতর হিতকারী। তখনকার দিনে শ্রমজীবিগণ পাঁচ মাস পরিশ্রম করিয়া সারা বৎসরের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল উৎপাদন করিতে পারিত বলিয়াই তাহারা যে-সমস্ত কুটীর-শিল্প-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত, সেই সমস্ত কুটীর-শিল্প-কার্য্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া জয়ী হওয়া কোন যন্ত্র-শিল্পের পক্ষে সম্ভবযোগ্য হইত না। ইহার ফলে আপনা হইতেই অস্বাস্থ্যকর যন্ত্র-শিল্পের পরিকল্পনা মানবসমাজের মধ্যে তখনকার দিনে স্থান পায় নাই।

দেশের প্রত্যেক নদী ও খাল যাহাতে সারা বৎসর জলে পরিপূর্ণ থাকে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখার ফলে ঋষি ও মুনিগণের অভ্যুদয়কালে অনায়াসে যেরূপ প্রচুর পরিমাণের কাঁচামাল ও ব্যবহারোপযোগী শিল্প-জাত দ্রব্যের উৎপাদন করা সম্ভব হইত, সেইরূপ আবার উহা যাহাতে প্রত্যেক মানুষটী প্রয়োজনীয় পরিমাণে পাইতে পারে এবং বিদ্যা, বুদ্ধি, পরিশ্রমশীলতা ও সততার তারতম্যানুসারে উহার পাওয়ার তারতম্য যাহাতে ঘটে, তজ্জন্য তখনকার দিনে দ্রব্য-মূল্যের মধ্যে যাহাতে সমতা (parity) রক্ষিত হয়, তদ্বিষয়েও লক্ষ্য রাখা হইত। সমাজের মধ্যে কাগজ ও ধাতুনির্ম্মিত কৃত্রিম মুদ্রা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইলে এক শ্রেণীর মানুষের পক্ষে কোন পরিশ্রম না করিয়া, প্রকৃত বিদ্যা ও বুদ্ধি অর্জ্জন না করিয়া, ঐ কাগজ ও ধাতুনির্ম্মিত কৃত্রিম মুদ্রা প্রচুর পরিমাণে উপার্জ্জন করা সম্ভব হয় এবং তখন অল্পবুদ্ধি শ্রমজীবিগণকে উহার সাহায্যে উচ্চতর মূল্যের অজুহাতে প্রলুব্ধ করিয়া তাহাদের শ্রমজাত দ্রব্যে তাহাদিগকে তাহাদের প্রয়োজনীয় ভাগ হইতে বঞ্চিত করিয়া পরোক্ষ ভাবে উহা কাড়িয়া লওয়া সম্ভব হয়।

এইরূপে সমাজের মধ্যে অসমান বিতরণ, অসততা ও শ্রমহীনতার সাফল্য ঘটিতে পারে, এই আশঙ্কায় কাগজ ও ধাতুনির্ম্মিত কৃত্রিম মুদ্রার পরিকল্পনা ও বহুল ব্যবহার হইতে মানুষ যাহাতে দূরে থাকে, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হইত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, কাগজ ও ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রার ব্যবহার না থাকিলে আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়ের প্রসার সাধন করা সম্ভব হয় না—কিন্তু তখনকার দিনে উহা পরিত্যাগ করিয়া কড়ি

প্রভৃতি স্বাভাবিক দ্রব্যের সাহায্যে দ্রব্য-বিনিময়ের যে ব্যবস্থা সাধিত হইয়াছিল, সেই ব্যবস্থার ফলে আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা বিষয়েও কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই।

নদীর ও খালের গভীরতা, কুটীর-শিল্পের প্রসার এবং দ্রব্যের বিনিময়-কার্য্যে স্বভাবজাত দ্রব্যকে মুদ্রারূপে ব্যবহার, প্রধানতঃ এই তিনটি সঙ্কেতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তখনকার দিনে মানবসমাজের প্রত্যেকে যাহাতে অর্থাভাব হইতে মুক্ত হয় এবং আর্থিক প্রাচুর্য্য উপভোগ করে, তাহার ব্যবস্থা সম্পাদিত হইয়াছিল।

মানুষের অস্বাস্থ্য সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার জন্য তখনকার দিনে তিনটি পন্থা পরিগৃহীত হইয়াছিল। প্রথমতঃ, নদী ও খালে যাহাতে বারমাস জল থাকে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সর্ব্বত্র বায়ু ও জল যাহাতে শুদ্ধ ও স্নিগ্ধ থাকে এবং রোগের বীজাণু-মুক্ত হয় তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইত। দ্বিতীয়তঃ, শব্দকে কি করিয়া স্পর্শ করিতে হয়, তাহার পন্থা আবিষ্কার করিয়া সাধকগণ যাহাতে নিজ শরীর-মধ্যে শরীর-গঠন-প্রণালী (anatomy), শরীর-বিধান-প্রণালী (physiology) ও বিবিধ দ্রব্য-সংযোগের ফলাফল (materia medica) প্রত্যক্ষ ভাবে অবগত হইতে পারেন, তাহার পদ্ধতি নির্ণীত হইয়াছিল এবং ইহার ফলে ক্রমশঃ অভ্রান্ত চিকিৎসা-বিদ্যা ও চিকিৎসা-শাস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের, এমন কি প্রত্যেক শ্রমজীবীটি পর্য্যন্ত যাহাতে স্বাস্থ্যরক্ষার প্রণালী ও বিবিধ খাদ্যাখাদ্যের ফলাফল পরিজ্ঞাত হইতে পারে, এবংবিধ শিক্ষা বিস্তার করিবার ব্যবস্থা সাধিত হইয়াছিল।

এইরূপে বায়ুর শুদ্ধতা ও স্নিগ্ধতা, চিকিৎসা-বিদ্যা ও চিকিৎসা-শাস্ত্রের আবিষ্কার এবং স্বাস্থ্য-বিষয়ক শিক্ষার বিস্তার—প্রধানতঃ এই তিনটি সঙ্কেতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তখনকার দিনে মানবসমাজের প্রত্যেকে যাহাতে স্বাস্থ্যাভাব হইতে মুক্ত হয় এবং স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্য উপভোগ করে, তাহার ব্যবস্থা সম্পাদিত হইয়াছিল।

মানুষের যাবতীয় অশান্তি ও অসন্তুষ্টি প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর। এক শ্রেণীর নাম দৈহিক এবং অপর শ্রেণীর নাম মানসিক। সাধারণতঃ কোন্ কোন্ কারণে মানুষের অশান্তি ও অসন্তুষ্টির উদ্ভব হয়, তাহার গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহার কারণ প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর। প্রথমতঃ, অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব সর্ব্ববিধ অশান্তি ও অসন্তুষ্টির প্রধান কারণ। দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নায়কগণের সমাজ ও রাষ্ট্র-সংগঠনে ব্যক্তি ও শ্রেণীবিশেষের উপর পক্ষপাতিত্বের অথবা অবিচারের জন্য সময় সময় অশান্তি ও অসন্তুষ্টি ভোগ করিতে হয়। তৃতীয়তঃ, স্বকীয় অব্যবস্থিতচিত্ততার জন্য মানুষের প্রায়শঃ অশান্তি ও অসন্তুষ্টির উদ্ভব হইয়া থাকে। ঋষি ও মুনিগণের অভ্যুদয়-কালে এই অশান্তি ও অসন্তুষ্টির উপরোক্ত তিন শ্রেণীর কারণ দূর করিবার জন্য সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর পন্থা অবলম্বিত হইত। প্রথমতঃ, যাহাতে অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব সমাজ হইতে সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয় এবং উহার প্রাচুর্য্য প্রত্যেকে উপভোগ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা সাধন করিয়া মানুষের দৈহিক অশান্তি ও অসন্তুষ্টির প্রধান কারণগুলি অপসারণ করা হইত। দ্বিতীয়তঃ, যাহাতে কেবলমাত্র সাধক, চরিত্রবান্, অভিমানশূন্য ও নিঃস্বার্থ কর্ম্মিগণ সমাজ ও রাষ্ট্রের অধিনায়কত্ব পাইতে পারেন এবং যাঁহারা অসাধু, চরিত্রহীন, অভিমানী এবং স্বার্থপর, তাঁহারা যাহাতে উহা না পাইতে পারেন এবং দণ্ডভোগ করেন, যাহাতে প্রত্যেক মানুষ প্রয়োজনোপযোগী প্রাচুর্য্যলাভ করিতে পারে এবং বিদ্যাবুদ্ধি, সততা ও শ্রমশীলতার তারতম্যানুসারে ঐ প্রাচুর্য্যের তারতম্য সংঘটিত হয়, তাহার ব্যবস্থা সাধন করিয়া দৈহিক অশান্তির ও অসন্তুষ্টির দ্বিতীয় শ্রেণীর কারণগুলি অপসারণ করিবার ব্যবস্থা সাধিত হইত।

মানুষের অশান্তি ও অসন্তুষ্টির তৃতীয় কারণ যে অব্যবস্থিতচিত্ততা, তাহার উদ্ভব হয় কেন, তদ্বিষয়ক সন্ধানে প্রয়াসী হইলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রধান কারণ চারিটি। যথা—রাগ, দ্বেষ, দ্বন্দ্ব এবং কলহ-প্রবৃত্তি। এই

চারিটি কারণ দূর করিবার একমাত্র উপায় মনস্তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় শিক্ষা ও সাধনা। ঋষিগণ মনস্তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় সমস্ত সত্য আবিষ্কার করিয়া তদ্বিষয়ক শিক্ষা ও সাধনার প্রবর্ত্তন করিয়া মানুষের অশান্তি ও অসন্তুষ্টির তৃতীয় শ্রেণীর কারণগুলি দূর করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

এইরূপে, অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাবের অপসারণ, সুবিচার, দণ্ড ও ধন-বিতরণের শৃঙ্খলা-সাধন এবং মনস্তত্ত্বের শিক্ষা ও সাধনার প্রবর্ত্তন—প্রধানতঃ এই তিনটি সঙ্কেতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তখনকার দিনের মানব-সমাজ হইতে যাহাতে অশান্তি ও অসন্তুষ্টি দূরীভূত হয়, তাহার ব্যবস্থা সম্পাদিত হইয়াছিল।

অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যুর কারণ সাধারণতঃ চারিটি। অর্থাভাব উহার প্রধান কারণ, স্বাস্থ্যাভাব উহার দ্বিতীয় কারণ, অশান্তি ও অসন্তুষ্টি উহার তৃতীয় ও চতুর্থ কারণ। এই চারিটি কারণ যাহাতে প্রবিষ্ট না হইতে পারে, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিলে অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু হইতে প্রায়শঃ আত্ম-রক্ষা করা সম্ভব হয়। তখনকার দিনে, অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি ও অসন্তুষ্টি যাহাতে মানবসমাজে প্রবেশলাভ করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে সতর্কতার আশ্রয় লওয়া হইয়াছিল বলিয়াই মানুষ প্রায়শঃ অকাল-বার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারিত।

অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি ও অসন্তুষ্টি যাহাতে প্রবেশলাভ না করিতে পারে, তদ্বিষয়ে গোড়া হইতেই সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারিলেই অকালবার্দ্ধক্যের হাত এড়ান যায় বটে, কিন্তু যিনি একবার অকালবার্দ্ধক্যের দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে কেবলমাত্র ঐ চারিটি কারণ দূর করিতে পারিলেই উহার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয় না। অর্থাভাব প্রভৃতি যাহাতে না থাকে, তাহা তো করিতেই হইবে, অধিকন্তু মনস্তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া শরীরের মধ্যে বার্দ্ধক্য কেন প্রবেশ করিতে পারে, তদ্বিষয়ক সত্যগুলি প্রত্যক্ষ করিয়া সাধনা-নিরত হইতে হইবে।

এইরূপে, ঋষি ও মুনিগণের অভ্যুদয়-কালে মানব-সমাজের প্রত্যেক

মানুষটি যাহাতে অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পায়, তাহার ব্যবস্থা সম্পাদিত হইয়াছিল।

ঋষি ও মুনিপ্রণীত গ্রন্থসমূহে উপরোক্তবিষয়ক তথ্যগুলি এবং তাহা অভ্যাস করিবার নির্দ্দেশগুলি যে সুস্পষ্ট, পরবর্ত্তী কোন শ্রেণীর গ্রন্থেই যে উহা আর তাদৃশভাবে বর্ণিত হয় নাই, ইহা আমরা আগেই বলিয়াছি।

দ্বিতীয় শ্রেণীর, অর্থাৎ "দেব", "রাজ" ও "সিংহ" উপাধিধারী মানুষগুলি যে সমস্ত গ্রন্থ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা অধ্যবসায় সহকারে অধ্যয়ন করিতে পারিলে ইহা মনে হইবে যে, ঋষি ও মুনিগণের অভ্যুদয়কালে মানুষের অর্থাভাব প্রভৃত দূর করিবার জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনা আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং যাহা মানবসমাজ আনন্দের সহিত পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা তখনও বিদ্যমান ছিল এবং তখনকার মানুষ উহা আনন্দের সহিত পালন করিতেন। এই সময়েও মানবসমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে অর্থাভাব অথবা স্বাস্থ্যাভাব অথবা অশান্তি অথবা অসন্তুষ্টি অথবা অকাল-বার্দ্ধক্য অথবা অকালমৃত্যু প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই। ইহা ছাড়া আরও প্রতীয়মান হইবে যে, অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যুর হাত হইতে মানবসমাজকে রক্ষা করিবার জন্য ঋষি ও মুনিগণ যে সমস্ত ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা এই সময়েও প্রতিপালিত হইত বটে, কিন্তু যে শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা তাঁহারা ঐ সমস্ত ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সেই শিক্ষা ও সাধনা মানুষ তখনই আংশিক পরিমাণে বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহার ফলে অর্থাভাব প্রভৃতি দূর করিবার উদ্দেশ্যে যে-সমস্ত ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার কোন্‌টির যে কি উদ্দেশ্য, তৎসম্বন্ধীয় সম্যক্ জ্ঞান মানুষ তখনই হারাইয়া ফেলিয়াছিল।

তৃতীয় শ্রেণীর, অর্থাৎ ভট্ট, আচার্য্য, সূরি ও দীক্ষিত উপাধিধারী মানুষগুলি যে সমস্ত গ্রন্থ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাঠ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, মানুষের অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব দূর

করিবার জন্য ঋষি ও মুনিগণ যে সমস্ত ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যস্থ কতকগুলি ব্যবস্থা তখনও আংশিক পরিমাণে বিদ্যমান ছিল এবং তাহার ফলে মনুষ্য-সমাজের অনেকেই তখনও অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব হইতে মুক্ত ছিল। অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব দূর করিবার ঐ ব্যবস্থাগুলি তখনও আংশিক পরিমাণে বিদ্যমান ছিল বটে, কিন্তু উহার শিক্ষা ও সাধনা প্রায়শঃ তখনই বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ফলে, তখনই মানুষের মধ্যে কথঞ্চিৎ পরিমাণে অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অশান্তি ও অসন্তুষ্টি, অথবা অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু দূর করিবার জন্য ঋষিগণের কালে যে সমস্ত ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনা সমাজ-মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা এই ভট্ট ও আচার্য্য প্রভৃতিগণের সময়ে সম্পূর্ণভাবে বিকৃততা প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং উহার ফলে অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু এই সময় হইতেই মানব-সমাজকে আচ্ছন্ন করিয়া আসিতেছে।

চতুর্থ শ্রেণীর, অর্থাৎ আধুনিক কালের গ্রন্থসমূহ হইতে ইহা দেখা যাইবে যে, মানুষের অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব দূর করিবার জন্য ঋষি ও মুনিগণ যে সমস্ত ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যস্থ অর্থাভাব দূর করিবার ব্যবস্থাগুলি এই চতুর্থ শ্রেণীর গ্রন্থকালপর্য্যন্ত আংশিকভাবে বিদ্যমান ছিল এবং এই সময় পর্য্যন্তও মনুষ্য-সমাজ অর্থাভাবে এতাদৃশ পরিমাণে বিধ্বস্ত হয় নাই। অবশ্য এ কথাও বলিতে হইবে যে, তৃতীয় শ্রেণীর ও চতুর্থ শ্রেণীর গ্রন্থকারসমূহ, অর্থাৎ ভট্ট, আচার্য্য, সূরি, দীক্ষিত, স্বামী, ভট্টাচার্য্য, অবধূত, তর্করত্ন প্রভৃতি উপাধিধারী মানুষগুলি ঋষিগণের কোন কথাই যথাযথভাবে বুঝিতে সক্ষম হন নাই বলিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং পরোক্ষভাবে অর্থাভাব প্রভৃতি দূর করিবার জন্য ঋষিগণ যে সমস্ত ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনার আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনা বিনষ্ট করিবার সহায়তা করিয়াছেন।

এই চারি শ্রেণীর গ্রন্থের কোন্ শ্রেণীটি কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, প্রথম শ্রেণীর, অর্থাৎ ঋষি ও মুনিগণ প্রণীত গ্রন্থগুলি যে কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ সঠিক ভাবে বলা অত্যন্ত দুরূহ। বেদাঙ্গ ও বেদের মধ্যে জ্যোতিষশাস্ত্র ও কালচক্র সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দ্বিতীয় শ্রেণীর, অর্থাৎ "দেব", "রাজ" ও "সিংহ" উপাধিধারী মানুষগুলির লিখিত গ্রন্থগুলি যে অন্ততঃপক্ষে ছয় হাজার বৎসর আগে, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর, অর্থাৎ ভট্ট, আচার্য্য, সূরি, দীক্ষিত, স্বামী, অবধূত, মিশ্র, তর্করত্ন প্রভৃতি উপাধিধারী মানুষগুলির গ্রন্থ যে গত তিন হাজার বৎসরের মধ্যে লিখিত হইয়াছে, ইহা সহজেই স্পষ্টভাবে অনুমান করা যায়।

এই চারি শ্রেণীর গ্রন্থের উপরোক্ত প্রণয়ন-কাল হইতে ইহা বলিতে হয় যে, ভারতবর্ষের মানুষ একদিন অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যুর হাত হইতে সম্পূর্ণভাবে যে রক্ষা পাইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহ; কিন্তু সেই দিন যে কত সহস্র বৎসর আগে হইতে বিদ্যমান ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। তবে বলা যাইতে পারে যে, যে সমস্ত ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা মানুষের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকালবার্দ্ধক্য ও অকাল-মৃত্যু হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয়, সেই সমস্ত ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনা কথঞ্চিৎ পরিমাণে ছয় হাজার বৎসর আগেও এই দেশের সমাজমধ্যে প্রবর্ত্তিত ছিল এবং গত ছয় হাজার বৎসর হইতে উহা বিকৃততা প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। গত তিন হাজার বৎসর হইতে ঐ বিকৃততা প্রায়শঃ সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। ইহার ফলে মানুষের অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু দূর করিবার জন্য ভারতবর্ষে একদিন যে সমস্ত ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সেই সমস্ত ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনা প্রায়শঃ গত তিন হাজার বৎসরের মধ্যে উত্তরোত্তর বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং তৎসঙ্গে অর্থাভাবাদি ভারতবাসিগণকে উত্তরোত্তর

অধিকতর পরিমাণে বিধ্বস্ত করিয়া তুলিয়াছে। এই তিন হাজার বৎসরের শেষ ভাগে ভারতবাসিগণের অর্থাভাবাদি যাদৃশ পরিমাণে তীব্রতা লাভ করিয়াছে, উহার প্রথমভাগে উহা তাদৃশ পরিমাণে তীব্রতা প্রাপ্ত হয় নাই।

ভারতবর্ষের যে গ্রন্থগুলির সাহায্যে ভারতবর্ষের ও ভারতবাসীর অতীত চিত্র সম্যক্‌ভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, সেই গ্রন্থগুলির সঙ্গে সঙ্গে জগতের অন্যান্য দেশের গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করিতে পারিলে জগতের ও জগদ্বাসীর অতীত চিত্রও সম্যক্‌ভাবে উদ্‌ঘাটিত করা সম্ভব হয়। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলিকে যেরূপ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, সেইরূপ প্রাচীন হিব্রু ও প্রাচীন আরবী ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলিকেও চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ঋষি ও মুনিপ্রণীত গ্রন্থগুলি যেরূপ সংস্কৃত ভাষার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ, প্রাচীন হিব্রু ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে সেইরূপ বাইবেল এবং প্রাচীন আরবী ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে কোরাণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ।

ঋষি ও মুনিপ্রণীত গ্রন্থগুলি হইতে যেরূপ মানবসমাজকে অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাবাদি হইতে মুক্ত করিবার ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনা সম্বন্ধে নির্দ্দেশ পাওয়া যায়, সেইরূপ বাইবেল ও কোরাণ হইতেও ঐ ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনার নির্দ্দেশ উদ্ধার করা সম্ভব হইতে পারে। সংস্কৃত ভাষা যেরূপ ভারতবর্ষের অন্যান্য সমস্ত ভাষার জননী, সেইরূপ হিব্রু ও আরবী ভাষা জগতের অন্যান্য সমস্ত ভাষার জননী।

ভট্ট, আচার্য্য প্রভৃতি গ্রন্থকারগণের দ্বারা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পরবর্ত্তী কালের গ্রন্থগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে যেরূপ বিবিধ সত্যোদ্‌ঘাটক বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং মানুষ তাহাদিগকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকে অথচ পরোক্ষভাবে ঐ গ্রন্থ ও গ্রন্থকারসমূহই ভারতবাসিগণের বর্ত্তমান হীনাবস্থার অন্যতম প্রধান কারণ, সেইরূপ গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় লিখিত গ্রন্থ-গুলিকেও আপাতদৃষ্টিতে বিবিধ সত্যোদ্‌ঘাটক বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে

এবং বর্ত্তমান সভ্যতার অনুচরগণ উহাদিগকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন বটে, কিন্তু ঐ গ্রন্থ ও গ্রন্থকারসমূহই পাশ্চাত্ত্য জগতের বর্ত্তমান পতিতাবস্থার অন্যতম মূল কারণ।

সমাজমধ্যে কোন্ ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনা প্রবর্ত্তিত হইলে প্রত্যেক মানুষটি অর্থাভাব প্রভৃতি হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহা যেমন ভারতবাসী ঋষি ও মুনিগণ সাধনার দ্বারা আবিষ্কার করিয়া ভারতবাসিগণের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন—সেইরূপ অন্যান্য দেশের মানুষগুলির মধ্যেও উপরোক্ত ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনা যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা অন্যান্য দেশের প্রাচীনতম গ্রন্থ, অর্থাৎ হিব্রু ভাষায় লিখিত বাইবেল এবং আরবী ভাষায় লিখিত কোরাণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিতে পারিলে সহজেই প্রতীয়মান হয়।

সংস্কৃত, হিব্রু এবং আরবী ভাষায় লিখিত প্রাচীন গ্রন্থগুলি যথাযথ অর্থে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, বেদ, বাইবেল এবং কোরাণের মধ্যে যেরূপ সত্যোদ্ঘাটনের সমতা বিদ্যমান রহিয়াছে, সেইরূপ ভট্ট, আচার্য্য প্রভৃতি গ্রন্থকারগণের লিখিত বিবিধ-বিষয়ক গ্রন্থগুলির ও গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যেও সত্য অপলাপের সমতা বিদ্যমান রহিয়াছে।

মোটের উপর, যাহা ভারতের অতীত চিত্র, তাহাই জগতের অতীত চিত্র, ইহা উপরোক্ত চারি শ্রেণীর প্রাচীন গ্রন্থ হইতে প্রমাণিত হইতে পারে।

প্রাচীন গ্রন্থসমূহই যে অতীত ইতিহাস প্রণয়নের একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য উপকরণ, তাহা বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই এবং উহা পারেন নাই বলিয়াই তাঁহারা বিবিধ প্রস্তরখণ্ড ও প্রাচীন অট্টালিকাসমূহের ভগ্নাবশেষ প্রভৃতিকে ইতিহাস প্রণয়নের অন্যতম উপকরণ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ইহা তাঁহাদের বহুদর্শিতার অভাবের পরিচায়ক। কোন কালের প্রকৃত ইতিহাস পরিজ্ঞাত হইতে হইলে বিবিধ

স্তরের মানুষের চিন্তাস্রোত ও কার্য্যস্রোত পরিজ্ঞাত হইবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। উচ্চতম চিন্তাশীল মানুষগুলির চিন্তাস্রোত অথবা কর্ম্মস্রোত কখনও কোন প্রস্তরখণ্ড অথবা অট্টালিকায় লিপিবদ্ধ হয় না। এই কারণে উহা হইতে যে প্রাচীন ইতিহাস প্রণীত হয়, তাহা কখনও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। অন্যদিকে চিন্তাশীল মানুষগুলি উহাঁদিগের প্রণীত প্রত্যেক গ্রন্থেই কোন না কোন ভঙ্গীতে সমাজের প্রত্যেক স্তরের মানুষের চিন্তা ও কর্ম্মস্রোতের কথা লিখিয়া থাকেন।

যখন সমাজের উন্নতির অবস্থা আরম্ভ হয়, তখন স্বতঃই চিন্তাশীল ব্যক্তির উদ্ভব হইতে থাকে এবং যে-সমস্ত চিত্র কাম-ক্রোধাদি কুৎসিত মনোভাবের উদ্দীপক, সেই সমস্ত চিত্র ঐ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কখনও অঙ্কিত করেন না। আর যখন সমাজের অবনতির অবস্থা চলিতে থাকে, তখন চিন্তাশীলতার বিলুপ্তি ঘটিতে আরম্ভ করে এবং যাঁহারা উচ্ছৃঙ্খল ও চরিত্রহীন, তাঁহারাও চিন্তাশীল বলিয়া আখ্যাত হইতে থাকেন। এই উচ্ছৃঙ্খল ও চরিত্রহীন গ্রন্থকারগণ যাহা অঙ্কিত করেন তাহা তথাকথিত আর্টের নামে প্রায়শঃ কাম-ক্রোধাদি কুৎসিত মনোভাবের উদ্দীপক হইয়া থাকে এবং পরোক্ষভাবে মানুষের সর্ব্বনাশ সাধন করে। এইরূপ ভাবে যে কোন সাহিত্যিক গ্রন্থ দেখিয়া সমাজের সমসাময়িক অবস্থা অতি অনায়াসে সুস্পষ্টভাবে অনুমান করা সম্ভবযোগ্য হয়।

ঋষি ও মুনিপ্রণীত কোন গ্রন্থে কোনরূপ কুৎসিত ভাবোদ্দীপক কোন কথা পাওয়া যায় না, অথচ গান্ধীজী অথবা রবীন্দ্রনাথ যাহা কিছু লিখিয়াছেন অথবা লিখিয়া থাকেন, তাহার প্রত্যেক ছত্রে ছত্রে রাগ, দ্বেষ, দ্বন্দ্ব, কলহ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যোদ্দীপক কথা পাওয়া যাইবে। ইহা হইতে, ঋষি ও মুনিগণের সমসাময়িক অবস্থা যে উন্নতিমুখী ছিল এবং গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক অবস্থা অবনতির দিকে প্রধাবিত, ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। এই অবনতির অবস্থায় যাঁহারা বাস্তবিক পক্ষে উচ্ছৃঙ্খলতা ও চরিত্রহীনতার সহায়ক,

তাঁহারাও চিন্তাশীল সমাজ-নায়ক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন।

কাযেই, প্রাচীন গ্রন্থসমূহকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করিয়া যে সমস্ত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত উদ্ধার করা হয়, তাহা প্রায়শঃ অবিশ্বাসযোগ্য নহে। এই হিসাবে আমাদের উপরোক্ত অতীত চিত্র উপেক্ষণীয় হইতে পারে না।

ভারতবর্ষের ও ভারতবাসীর বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ চিত্র

যে ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনা বিদ্যমান থাকিলে সমাজের প্রত্যেক মানুষটির পক্ষে অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকালবার্দ্ধক্য এবং অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, সেই ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনা যে সমগ্র জগতের মানব-সমাজের মধ্যে ছয় হাজার বৎসর আগে প্রবর্ত্তিত ছিল এবং গত ছয় হাজার বৎসর হইতে উহা যে উত্তরোত্তর বিকৃতি প্রাপ্ত হইতেছে তাহা আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী সন্দর্ভে দেখাইয়াছি। মানুষের অর্থাভাবাদির অপনয়নকারী ঐ ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনা গত ছয় হাজার বৎসর হইতে উত্তরোত্তর বিকৃতি প্রাপ্ত হইতেছে বটে, কিন্তু দুইশত বৎসর আগেও কোন বিপরীত ব্যবস্থা অথবা শিক্ষা অথবা সাধনা জগতের কুত্রাপি প্রবর্ত্তিত হয় নাই এবং তখনও প্রাচীনতম ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনার চিহ্নবিশেষ সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হইতে পারে নাই। অর্থাভাবাদি দূর করিয়া মানুষের আর্থিক প্রাচুর্য্য, শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক শান্তি, সন্তুষ্টি, দীর্ঘযৌবন এবং দীর্ঘজীবন রক্ষা করিতে হইলে যে ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন, অল্পাধিক গত দুইশত বৎসর হইতে মানুষ ঠিক তাহার বিপরীত ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনা গ্রহণ করিয়াছে।

মানুষকে প্রকৃত মানুষ হইয়া উঠিতে হইলে, যে যে স্বাভাবিক কার্য্যশক্তি লইয়া কোন মানুষ জন্মগ্রহণ করে, সেই সেই কার্য্যে সে যাহাতে নিপুণতা লাভ করে এবং পরবর্ত্তী জীবনে ঐ ঐ কার্য্য-নির্ব্বাহের

দায়িত্ব যাহাতে তাহার স্কন্ধে ন্যস্ত হয়, তাদৃশ শিক্ষা ও সাধনার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়।

স্বভাবতঃ মানুষ শ্রমজীবী (শূদ্র) ও বুদ্ধিজীবী (আর্য্য) নামক দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে। বাল্যাবস্থায় সমস্ত বালকের চাল-চলন পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, কোন কোন বালক স্বভাবতঃ যেরূপ শারীরিকশ্রমপটু হইয়া থাকে, শত চেষ্টা করিয়াও তাহাকে তাদৃশ বুদ্ধি-শ্রম-পটু করিয়া গড়িয়া তোলা সম্ভব হয় না। আবার, কোন কোন বালক স্বভাবতঃ অত্যন্ত বুদ্ধি-শ্রম-পটু হইয়া থাকে। যাহারা স্বভাবতঃ বুদ্ধি-শ্রম-পটু, তাহাদিগের পিছনে যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিয়াও তাহাদিগকে দৈহিক শ্রম-পটু করিয়া গড়িয়া তোলা সম্ভব হয় না। স্বভাবের এই বিষয় অনুসরণ করিয়া শিক্ষা ও কার্য্যক্ষেত্রে একদিন মানুষকে শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবী নামে দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইত এবং তাহাদিগকে যথাক্রমে শারীরিক শ্রমের ও বুদ্ধির কার্য্যে নিযুক্ত করা হইত। যাহারা শারীরিক শ্রমের কার্য্যে শিক্ষা পাইত, তাহাদিগকে কখনও বুদ্ধির কার্য্যের দায়িত্বভার দেওয়া হইত না, আবার যাহারা বুদ্ধির কার্য্যে শিক্ষা পাইত, তাহাদিগকে কখনও কায়িক শ্রমের কার্য্যের দায়িত্বভার দেওয়া হইত না। স্বাভাবিক কর্ম্মশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মানবসমাজের এই শ্রেণী-বিভাগ যে গত বার হাজার বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছিল এবং দুইশত বৎসর আগেও যে ইহা কথঞ্চিৎ বিকৃতভাবে দেখা যাইত, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইতে পারে। এখন আর মানুষের উপর দায়িত্বভার অর্পণে ঐ স্বাভাবিক শ্রেণীবিভাগের কথা স্মরণ করা হয় না, পরন্তু শিক্ষার নামে কতকগুলি চরিত্রহীন, উচ্ছৃঙ্খল মানুষের দেওয়া ২।১ খানি সার্টিফিকেট পাইলেই মানুষ সর্ব্ববিধ দায়িত্বভার গ্রহণ করিবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। ফলে, 'উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে' গিয়া পড়িতেছে এবং বাহবা দিবার উপযোগী উচ্ছৃঙ্খলতা সমাজের মধ্যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

প্রত্যেক মানুষটী যাহাতে অর্থাভাব হইতে মুক্ত হয়, তাহা করিতে হইলে তিনটি সঙ্কেত আশ্রয় করা সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজনীয় ; যথা :—(১) নদী ও খালে সারাবৎসর জল রক্ষা করিবার উপযোগী গভীরতা, (২) কুটীর-শিল্পের প্রসার, (৩) দ্রব্যের বিনিময়-কার্য্যে কড়ি প্রভৃতি কোন স্বভাবজাত দ্রব্যকে মুদ্রারূপে ব্যবহার। এই তিনটি সঙ্কেত যে অর্থাভাব দূর করিবার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা আমরা আগেই দেখাইয়াছি।

নদী ও খালসমূহে যাঁহাতে সারাবৎসর জল থাকে, তাহা করিবার জন্য প্রথমতঃ বর্ষাকালে যাহাতে নিয়মিত বৃষ্টি হয়, দ্বিতীয়তঃ পাহাড়ের উপর নদীর উৎপত্তিস্থলে যাহাতে স্রোতের বিঘ্নকর কিছু উৎপন্ন না হয়, তৃতীয়তঃ পাহাড় হইতে সমতল ভূমিতে প্রবেশ লাভ করিবার পর নদীর স্রোত যাহাতে নদীর গভীরতা উৎপাদনে কোনরূপ বাধা না পায়, চতুর্থতঃ নদীর উৎপত্তি-স্থল হইতে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত নদীর স্রোতের যাহাতে কোনরূপ বাধাপ্রাপ্তি না ঘটে এবং উহা কোন স্থলে শুষ্ক হইয়া না যায়, তাহা করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে।

বর্ষাকালে যাহাতে নিয়মিত বৃষ্টি হয়, তাহা করিতে হইলে, যাহাতে ভূমিখণ্ডে প্রচুর পরিমাণে রস থাকে এবং ঐ রস বাষ্পাকারে উত্থিত হইয়া মেঘের গঠন সাধিত করে এবং মেঘ যাহাতে বর্ষণের আগে স্থানান্তরিত হইতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয়। ভূমিখণ্ডে যাহাতে প্রচুর পরিমাণে রস থাকে, তাহা করিতে হইলে ভূমির গভীরতম প্রদেশ হইতে যাহাতে রসোৎপাদক খনিজ পদার্থসমূহ স্থানান্তরিত না হয় এবং ঐ গভীরতম প্রদেশের জল যাহাতে উত্তোলিত না হয়, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজনীয়। স্মরণাতীত কাল হইতে যে, ভারতবর্ষে এতদ্বিষয়ে নজর রাখিবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল, তাহার সাক্ষ্য বেদ ও সংহিতায় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ঐ প্রয়োজনীয়তার কথা মানুষ অনেকদিন হইতেই ভুলিয়া গিয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু কার্য্যতঃ দুইশত বৎসর আগেও উহার কোন বৈপরীত্য সাধন করে নাই, কারণ তখনও

অত্যধিক পরিমাণে খনিজ পদার্থগুলি উত্তোলিত হয় নাই এবং টিউব-ওয়েলের এত ছড়াছড়ি দেখা যায় নাই। আর এক্ষণে মাইনিং-এর ও টিউবওয়েলের পরিকল্পনার প্রসার সাধন করিয়া বৈজ্ঞানিকতার ছড়াছড়ি করা হইতেছে বলিয়া মানুষ মনে করিতেছে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি-বৃদ্ধি এবং জমীর উর্ব্বরতার হ্রাস সাধন করা হইতেছে। এক কথায়, মানুষ প্রধানতঃ যাহার উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে, তাহারই উচ্ছেদ সাধন করিতেছে।

মেঘ যাহাতে বর্ষণের আগে স্থানান্তরিত না হয়, তদ্বিষয়ে সতর্ক হইতে হইলে ব্যোমযানের ব্যবহার একান্তভাবে বর্জ্জনীয়। সাধারণতঃ মানুষ মনে করিয়া থাকে যে, ব্যোমযান আধুনিক বিজ্ঞানের একটি নূতন আবিষ্কার। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা সত্য নহে। শিল্প সম্বন্ধে ঋষিদিগের যে সমস্ত গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে, তাহা হইতে আমাদের এই কথার সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে। "শব্দ-স্ফোট" উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, "ব্যোম-যান" এই শব্দটির মধ্যেই বায়ুর সহায়তায় কি করিয়া ব্যোম-যান প্রস্তুত করিতে হয়, তাহার সূত্র ও সঙ্কেত লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। স্মরণাতীত কালে ভারতীয়গণ ব্যোমযান প্রস্তুত করিতে জানিতেন, অথচ অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি যাহাতে না হয়, তজ্জন্য উহার ব্যবহার বর্জ্জন করিয়াছিলেন। অল্পাধিক দুইশত বৎসর আগেও উহার ব্যবহারের কোন পরিকল্পনা মানুষের অন্তঃকরণে স্থান পায় নাই। অধুনা উহার ব্যবহার সখের কার্য্যে পরিণত হইয়াছে এবং ক্রমশঃই প্রসার লাভ করিতেছে। ফলে, অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির সহায়তা সাধিত হইতেছে।

পাহাড়ের উপর নদীর উৎপত্তিস্থলে যাহাতে স্রোতের বিঘ্নকর কিছু উৎপন্ন না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে, পাহাড়ের উপর যাহাতে কোন বৃহৎ সহর ও রাস্তা নির্ম্মিত না হয়, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। বেদ ও স্মৃতির মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, স্মরণাতীত কাল হইতে ঋষি ও মুনিদিগের এতদ্বিষয়ে সতর্কতা

বিদ্যমান ছিল এবং দুইশত বৎসর আগেও মানবসমাজ কার্য্যতঃ এতাদৃশ সর্ব্বনাশক পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ করে নাই। আর অধুনা শৈলাবাসই মানুষের অন্যতম সখের কার্য্য এবং শৈল-রাস্তা আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম গর্ব্বের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিস্তৃত শৈলাবাস (hill town) ও বিস্তৃত শৈল-রাস্তা (hill road) বর্জ্জন করিবার পরিকল্পনা অধুনা অসভ্যতার নিদর্শন বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

পাহাড় হইতে সমতল ভূমিতে প্রবেশলাভ করিবার পর নদীর স্রোত যাহাতে নদীর গভীরতা উৎপাদনে কোনরূপ বাধা না পায়, তাহা করিতে হইলে নদীর মধ্যে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড (boulders) নিক্ষেপ করা, বিস্তৃতভাবে জলপথ নির্ম্মাণ করা এবং বিস্তৃত সেতু নির্ম্মাণ করার পরিকল্পনা একান্ত-ভাবে বর্জ্জনীয়। এতদ্বিষয়েও স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতীয় ঋষিগণ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। অথর্ব্ববেদ, বিবিধ সংহিতা ও ঋষি-প্রণীত শিল্প-গ্রন্থে ঐ সতর্কতার নিদর্শন পাওয়া যাইবে। দুইশত বৎসর আগেও কার্য্যতঃ এতাদৃশ কর্ম্মের পরিকল্পনা মানব-হৃদয়ে স্থান পায় নাই। কিন্তু আধুনিক এঞ্জিনিয়ারগণ ঐ তিনটি পরিকল্পনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে গর্ব্বানুভব করিয়া থাকেন। ফলে, নদীসমূহ আর তাহাদের গভীরতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইতেছে না এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে বন্যা ও জল-প্লাবনের মাত্রা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে।

এরূপভাবে একদিন যে-সমস্ত কার্য্যের সহায়তায় নদীসমূহে বার মাস গভীরভাবে জল রক্ষা করিবার ব্যবস্থা সম্পাদিত হইত, এক্ষণে তাহার বিপরীত আচরণ করিয়া বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক নদীর শুষ্কতা সাধন করিতেছেন এবং মানুষের সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইতেছে।

কুটীর-শিল্পের প্রসার সাধন করিতে হইলে একদিকে যাহাতে শ্রমজীবিগণ বৎসরের মধ্যে পাঁচমাস মাত্র পরিশ্রম করিয়া প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল উৎপাদন করিতে পারে এবং অন্যদিকে যাহাতে যন্ত্র-শিল্পের পরিকল্পনা বর্জ্জিত হয়, তাহার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। এই

ব্যবস্থার দিকেও ভারতীয় ঋষিগণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল। বেদ, সংহিতা এবং ঋষিপ্রণীত শিল্প-গ্রন্থে ইহার সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে। যন্ত্র-শিল্প আধুনিক আবিষ্কার বলিয়া বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকের ধারণা। ইহাও সত্য নহে। শব্দ-স্ফোট পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, 'যন্ত্র' এই শব্দটির মধ্যেই কি করিয়া বায়ুর সহায়তায় যন্ত্রের পরিচালন ও নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহার সূত্র ও সঙ্কেত নিহিত রহিয়াছে। যাঁহারা বেদ ও বর্ত্তমান যন্ত্র-সম্বন্ধীয় এঞ্জিনিয়ারীং (mechanical, hydraulic and automobile engineering etc.) অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা চিন্তা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, বেদে বায়ু, জল ও তেজ সম্বন্ধে কথা ও অঙ্ক-শাস্ত্র যত আমূলভাবে লিপিবদ্ধ আছে, তাহার তুলনায় ঐ সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান এঞ্জিনিয়ারীং-এর কথা অতীব অকিঞ্চিৎকর ও হাস্যকর। এই সমস্ত কথা মানুষ অনেকদিন হইতে বিস্মৃত হইয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু দুই শত বৎসর আগেও কার্য্যতঃ উহার কোন বিপরীত আচরণ করে নাই, কারণ তখনও জমীর উর্ব্বরা-শক্তিহানিকর কার্য্যে মানুষ হস্তক্ষেপ করে নাই এবং তখনও কোন বিস্তৃত যন্ত্র-শিল্পের পরিকল্পনা মানুষ গ্রহণ করে নাই। আর অধুনা, আধুনিক বৈজ্ঞানিকের প্রায় প্রত্যেক কার্য্য জমীর উর্ব্বরতার হ্রাস সাধন করিতেছে এবং শ্রমজীবীর পক্ষে পাঁচমাস তো দূরের কথা, সারাবৎসর পরিশ্রম করিয়াও প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল তৈয়ারী করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং যন্ত্র-শিল্পের প্রসার সাধন করা প্রায় প্রত্যেকের আরাধ্য কর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে।

সমাজমধ্যে যাহাতে কোন দ্রব্যের অসমান বিতরণ না হয়, প্রত্যেকে যাহাতে অন্ততঃ পক্ষে প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে আবশ্যকীয় বস্তুসমূহ পাইতে পারেন, যোগ্যতানুসারে যাহাতে আবশ্যক বস্তুসমূহের বিতরণের তারতম্য ঘটে, এই তিনটি ব্যবস্থা যে সমাজের অর্থাভাবজনিত অসন্তুষ্টি নিবারণের অন্যতম প্রধান পন্থা এবং ঐ তিনটি ব্যবস্থা সম্পাদিত করিতে হইলে যে দ্রব্যের বিনিময়-কার্য্যে কড়ি প্রভৃতি কোন না কোন স্বভাবজাত দ্রব্যকে

মুদ্রারূপে ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজনীয় এবং তজ্জন্য যে ধাতু ও কাগজে নির্ম্মিত মুদ্রার বিকৃত ব্যবহার সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি। এতৎ সম্বন্ধেও ঋষিগণ সতর্ক ছিলেন। তাহার পরিচয়ও বেদ এবং সংহিতায় পাওয়া যাইবে। ইহার বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং যুক্তি-যুক্ততাও মানবসমাজ অনেক দিন হইতে বিস্মৃত হইয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু কার্য্যতঃ দুই শত বৎসর আগেও ইহার বিপরীত আচরণ করে নাই। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, দুইশত বৎসর আগেও কড়ি প্রভৃতি স্বভাবজাত বস্তুর সহায়তায় জগতের বহু দেশে দ্রব্যের বিনিময়-কার্য্য সম্পাদিত হইত এবং তখনও ধাতু এবং কাগজ-নির্ম্মিত মুদ্রার এতাদৃশ বিস্তৃত প্রচলন কোন দেশে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। আর অধুনা, জগতের প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক গবর্ণমেণ্ট ধাতু এবং কাগজ-নির্ম্মিত মুদ্রার উৎপাদনে অত্যধিক তৎপর হইয়াছেন। ১৯১১ সালে সারা জগতে কত পরিমাণের ধাতু ও কাগজ-নির্ম্মিত মুদ্রা প্রচলিত ছিল, আর ১৯৩১ সালেই বা ঐ পরিমাণ কত বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, প্রায় সহস্রগুণ পরিমাণে উহা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে, অসমান বিতরণজনিত অসন্তুষ্টি সর্ব্বত্র বৃদ্ধি পাইতেছে এবং হৃদয়বিদারক ভাবে কতকগুলি চরিত্রহীন ধনীর সন্তান কোনরূপ ধনবৃদ্ধির সহায়তা না করিয়া ব্যভিচারিণী সেক্রেটারীর অঙ্ক পরিশোভিত করিয়া সমাজের মধ্যে নায়কত্ব করিতে পারিতেছে, আর ধর্ম্ম-জ্ঞানযুক্ত চরিত্রবান্ শ্রমজীবীর সন্তান প্রতিনিয়ত রৌদ্র ও বৃষ্টিতে পরিশ্রম করিয়া সর্ব্বদা সমাজের খাদ্য ও ব্যবহার্য্য সরবরাহ করিয়াও নিজেরা অন্নহীন হইয়া অবজ্ঞেয় অবস্থায় দিন যাপন করিতেছে।

এইরূপে যে অর্থাভাব একদিন মানবসমাজের অপরিজ্ঞাত ছিল, সেই অর্থাভাবের হাহাকার জগতের প্রায় প্রত্যেক গৃহে স্থান পাইয়াছে এবং তথাপি যে যে ব্যবস্থায় উহা নিবারিত হইতে পারে, তাহাতে হস্তক্ষেপ না করিয়া সম্পূর্ণভাবে উহার বিপরীত আচরণ করিতেছে এবং ঐ বৈপরীত্য

উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে, এই মানুষগুলিই কোথায়ও বা সুনিপুণ বৈজ্ঞানিক, কোথায়ও বা সুনিপুণ অর্থ-নৈতিক, আর কোথায়ও সুনিপুণ শাসক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতেছে।

স্বাস্থ্যবিষয়ক অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিলেও ঠিক একই কথার প্রতিধ্বনি পাওয়া যাইবে।

সর্ব্বসাধারণের শারীরিক স্বাস্থ্য যাহাতে বজায় থাকে, তাহা করিতে হইলে তিনটি ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। প্রথমতঃ, বায়ুর শুদ্ধতা ও স্নিগ্ধতা-রক্ষা, দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যক্ষীভূত শরীর-গঠন, শরীর-বিধান ও ভৈষজ্য-বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসা-বিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্রের আবিষ্কার এবং তৃতীয়তঃ, স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষার বিস্তার। এই তিনটি কার্য্যের উদ্দেশ্যে উপরোক্ত তিনটি ব্যবস্থার আবশ্যক হইয়া থাকে। আমরা ইহা ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর অতীত চিত্র উদ্ঘাটন-কালে দেখাইয়াছি।

বায়ুর শুদ্ধতা ও স্নিগ্ধতা রক্ষা করিতে হইলে জল ও স্থল, এই উভয়েরই শুদ্ধতা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। কারণ, জল ও স্থল শুদ্ধ না থাকিলে উহা হইতে দুষ্ট বাষ্প উদ্গত হইতে থাকে এবং তদ্দ্বারা বায়ুর অশুদ্ধি সংঘটিত হয়। জলের শুদ্ধতা রক্ষা করিতে হইলে উহার মধ্যে যাহাতে কোনরূপ দুষ্ট দ্রব্য নিপতিত না হইতে পারে এবং সর্ব্বত্র (অর্থাৎ নদী খাল, পুষ্করিণীতে পর্য্যন্ত) যাহাতে স্রোত রক্ষিত হইতে পারে, প্রধানতঃ তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হয়। স্থলের শুদ্ধতা রক্ষা করিতে হইলে প্রথমতঃ, স্থলের প্রত্যেক স্তরে যাহাতে বায়ু গমনাগমন করিতে পারে, দ্বিতীয়তঃ, উহার সর্ব্ব-নিম্ন স্তর পর্য্যন্ত প্রত্যেক অণু ও পরমাণু যাহাতে প্রয়োজনানুরূপ রস সিঞ্চিত থাকে, তৃতীয়তঃ, উহার আবরণে যাহাতে কোনরূপ বিষাক্ত দ্রব্য নিহিত না থাকে, চতুর্থতঃ, উহার উপরে যে সমস্ত চর ও অচর জীব অবস্থিত থাকে অথবা বিচরণ করে, তাহাদের প্রশ্বাসে ও চালচলনে যাহাতে কোন বিষাক্ত দ্রব্য নির্গত না হয়, প্রধানতঃ তাহার দিকে লক্ষ্য করিতে হয়। জল ও স্থলের শুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য

এই সমস্ত বিষয়ে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা যে স্মরণাতীত কালে ঋষিগণ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন এবং তদ্বিষয়ে তাঁহারা যে সতর্ক ছিলেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহাদিগের প্রণীত ব্যবস্থাশাস্ত্রে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলে সাক্ষ্য পাওয়া যায়। ঐ প্রয়োজনীয়তার কথা ও বিজ্ঞান বহুদিন হইতেই মানুষ ভুলিয়া গিয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু দুই শত বৎসর আগেও কার্য্যতঃ মানবসমাজ উহার বিরুদ্ধাচরণ করে নাই। গত দুইশত বৎসরের মধ্যে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ রেলপথ-নির্ম্মাণের অজুহাতে নানা স্থানে রাস্তা ও সেতু নির্ম্মাণ করায় এবং বৈজ্ঞানিক জলসেচ-প্রণালীর (irrigation) অজুহাতে বাঁধ ও অগভীর খালের প্রবর্ত্তন করায়, জলস্রোত অপ্রতিহত রাখা তো দূরের কথা, উহা যাহাতে প্রতিহত হয়, তাহার কার্য্য করিয়া আসিতেছেন।

ইহা ছাড়া বৈজ্ঞানিক মল-নির্গমন-প্রণালী (sewerage) নির্ম্মাণের অজুহাতে ভূগর্ভস্থ নর্দ্দমার দ্বারা প্রবাহিত মল খাল ও নদীর মধ্যে নিষ্কাশিত করিবার ব্যবস্থা সাধন করিয়া জলের শুদ্ধতা রক্ষা করা তো দূরের কথা, জলের অশুদ্ধি সম্পাদন করিতেছেন। এইরূপ ভাবে আধুনিক কালে যেরূপ জলের অশুদ্ধতা সম্পাদিত হইতেছে, সেইরূপ আবার স্থলভাগও আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের দ্বারা দূষিত হইয়া পড়িতেছে। প্রতিনিয়ত রেলগাড়ীর চাপ পড়ায় মৃত্তিকাভাগ এত অধিক পরিমাণে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে যে, এখন আর উহার প্রত্যেক স্তরের অণু ও পরমাণু-মধ্যে বায়ুর চলাচল সুসাধ্য থাকিতে পারিতেছে না। নদীগুলি ক্রমশঃ অগভীর ও দুর্ব্বল-স্রোতোযুক্ত অথবা স্রোতোহীন হইয়া পড়ায় সর্ব্ব-নিম্নস্তর পর্য্যন্ত রসের প্রবেশ দুর্গম হইয়া পড়িতেছে। মোটরগাড়ীর যাতায়াতের সুবিধার জন্য রাস্তাগুলি নানারূপ বিষাক্ত দ্রব্য-নির্ম্মিত আবরণের দ্বারা আবৃত হওয়ায় প্রতিনিয়ত উহা হইতে বিষাক্ত বাষ্প উদ্গত হইতেছে। খাদ্যাখাদ্যের বিচার না থাকায় চর জীবগণের পাকস্থলী হইতে অনবরত বিষাক্ত বাষ্প প্রশ্বাসের সহিত নির্গত হইতেছে। কৃত্রিম

-সার ব্যবহারের প্রসার সাধিত হওয়ায় উহা উদ্ভিদের প্রশ্বাসকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে এবং ঐ বিষাক্ত প্রশ্বাস বায়ুর সহিত মিলিত হইতেছে। ইহা ছাড়া রেলগাড়ী ও যন্ত্র-শিল্পের বহুল প্রচলনে তাহা হইতে যে কয়লার ধূমা নির্গত হইতেছে, উহাও বিষাক্ত এবং উহাও বায়ুকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে। এইরূপ ভাবে একদিকে যেরূপ জল ও স্থল হইতে বিষাক্ত বাষ্প উদ্গত হইয়া বায়ুকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে, সেইরূপ আবার মানুষের কার্য্যের ফলেও উহা বিষাক্ত হইতেছে।

মানুষের শরীর-গঠন ও শরীর-বিধান এবং ভৈষজ্যবিজ্ঞান যথাযথ ভাবে প্রত্যক্ষ করিবার একমাত্র উপায় শব্দকে কি করিয়া স্পর্শ করিতে হয় তাহার কৌশল পরিজ্ঞাত হওয়া। এই কৌশল ঋষিগণ পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া তখনকার দিনে বিশ্বাস-যোগ্য চিকিৎসাবিদ্যা ও চিকিৎসা-শাস্ত্রের উদ্ভব হওয়া সম্ভবপর হইয়াছিল। ঐ চিকিৎসা-বিদ্যা ও চিকিৎসা-শাস্ত্র মানুষ বহুদিন হইতে ভুলিয়া গিয়াছে এবং তাহার জন্য চিকিৎসা-শাস্ত্রের অব্যর্থতাও অনেক দিন হইতে নষ্ট হইয়াছে ইহা সত্য, কিন্তু দুইশত বৎসর আগেও চিকিৎসার নামে মানুষ এমন কিছু করে নাই, যদ্দ্বারা মানুষের প্রাণনাশ অথবা অকর্ম্মণ্যতা ঘটিতে পারে। বর্ত্তমানে শবদেহ দেখিয়া সজীব দেহের শরীর-গঠন ও শরীর-বিধান অনুমান করা হইয়া থাকে এবং মনুষ্যেতর প্রাণীর উপর পরীক্ষা করিয়া মানুষের ভৈষজ্য-বিজ্ঞান স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। ইহার ফলে এক্ষণে, ব্যাধি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যে চিকিৎসা-বিদ্যা ও চিকিৎসা-শাস্ত্রের আশ্রয় লওয়া হইয়া থাকে, তাহা সর্ব্বতোভাবে আনুমানিক হইয়া পড়ে এবং তাহার ফলে প্রত্যক্ষীভূত শরীর-গঠন, শরীর-বিধান ও ভৈষজ্য-বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হইবার আশা সুদূরপরাহত হইয়া পড়িতেছে।

প্রত্যক্ষীভূত শরীর-গঠন, শরীর-বিধান ও ভৈষজ্য-বিজ্ঞানের আবিষ্কার সুদূরপরাহত হওয়ায়, কোন্ খাদ্য ও চালচলন কোন্ অবস্থার কোন্ মানুষের পক্ষে উপকারক অথবা অপকারক, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া

অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। ইহার ফলে একে তো সর্ব্বসাধারণকে স্বাস্থ্য-বিষয়ক প্রকৃত শিক্ষা প্রদান করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িতেছে, তাহার উপর আবার তাহাদিগকে ঐ বিষয়ে যে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা তাহাদের স্বাস্থ্যসাধক না হইয়া স্বাস্থ্য-বিনাশক হইতেছে।

এইরূপে যে স্বাস্থ্যাভাব একদিন মানব-সমাজের অপরিজ্ঞাত ছিল, সেই স্বাস্থ্যাভাবে প্রায় প্রত্যেক মানুষটি হাবুডুবু খাইতেছে এবং তথাপি যে যে ব্যবস্থায় উহা নিবারিত হইতে পারে, তাহাতে হস্তক্ষেপ না করিয়া মানুষ সম্পূর্ণ ভাবে উহার বিপরীত আচরণ করিতেছে এবং ঐ বৈপরীত্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

সন্তুষ্টি ও শান্তি বিষয়ে মানুষ কোন্ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহার দিকে লক্ষ্য করিলেও হতাশ্বাস হইতে হয়।

মানুষের মনে শান্তি ও সন্তুষ্টি থাকিলে, মানুষ প্রতিনিয়ত এত অধিক পরিবর্ত্তন-প্রয়াসী হইত না এবং প্রতিনিয়ত নূতন নূতন মতবাদ ও নূতন নূতন দলের উদ্ভব হইতে পারিত না। মানুষের মনে বর্ত্তমান সময়ে যে শান্তি ও সন্তুষ্টি নাই, তৎসম্বন্ধে মনুষ্যসমাজের উপরোক্ত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে যেরূপ কৃতনিশ্চয় হওয়া যায়, সেইরূপ আবার ব্যক্তিগত ভাবে আত্মপরীক্ষা করিলেও উহা বুঝিতে পারা যায়।

মানুষের শান্তি ও সন্তুষ্টি বজায় রাখিতে হইলে প্রথমতঃ অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব যাহাতে অপসারিত করিতে পারা যায়, দ্বিতীয়তঃ সুবিচার, দণ্ড ও ধন-বিতরণের শৃঙ্খলা যাহাতে সাধিত করা যায়, এবং তৃতীয়তঃ মনস্তত্ত্বের প্রয়োগযোগ্য শিক্ষা ও সাধনা যাহাতে প্রবর্ত্তিত হয়, তজ্জন্য প্রযত্নশীল হওয়া আবশ্যক। এই তিনটি ব্যবস্থা সাধিত করিবার জন্য কি কি প্রয়োজন, তাহা যে ভারতীয় ঋষিগণ একদিন সম্যক্‌ভাবে স্থির করিতে পারিয়াছিলেন এবং উহা যে মনুষ্যসমাজে একদিন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহাও তাঁহাদিগের প্রণীত গ্রন্থ হইতে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হইতে পারে। ঐ ঐ ব্যবস্থা ও বিজ্ঞান মানুষ অনেকদিন হইতেই বিস্মৃত

হইয়াছে তাহা সত্য এবং ঐ ঐ ব্যবস্থা অবহেলার চক্ষে অনেকদিন হইতে দেখিয়া আসিতেছে তাহাও সত্য, কিন্তু কিছুদিন আগেও উহার বিপরীত ভাবের কোন আচরণে মানুষ হস্তক্ষেপ করে নাই।

অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব যাহাতে জনসাধারণের মধ্য হইতে অপসারিত হয়, তাহার জন্য কি কি করা কর্ত্তব্য, উহার জন্য যাহা যাহা করা কর্ত্তব্য তাহা ভুলিয়া গিয়াও মানুষ যে অনেকদিন পর্য্যন্ত কোন বিপরীত আচরণ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে নাই এবং অধুনা ঐ বিপরীত আচরণ যে পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহা আমরা আগেই দেখাইয়াছি।

সুবিচার ও দণ্ড যথাযথভাবে সাধন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে, যাহাতে কেবলমাত্র সাধক, চরিত্রবান্, রাগ-দ্বেষ-বিযুক্ত, দ্বন্দ্ব ও কলহ-প্রবৃত্তিবিহীন, অভিমানশূন্য ও নিঃস্বার্থ কর্ম্মিগণ সমাজ ও রাষ্ট্রের অধিনায়কত্ব পাইতে পারেন, এবং যাঁহারা সাধনাহীন, চরিত্রহীন, রাগ-দ্বেষ-যুক্ত, দ্বন্দ্ব ও কলহপ্রমত্ত, অভিমানী ও স্বার্থ-পরায়ণ মানুষ, তাঁহারা যাহাতে উহা না পাইতে পারেন এবং দণ্ডভোগ করেন, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ইহাও আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি। সমাজের প্রত্যেকের শান্তি ও সন্তুষ্টি বিধান করিবার জন্য যে উপরোক্ত ভাবে সুবিচার ও দণ্ডবিধান করিবার একান্ত প্রয়োজন, তাহাও ভারতীয় ঋষিগণ স্মরণাতীতকালে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন এবং উহার ব্যবস্থাও সমাজমধ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সুবিচার ও দণ্ডের বিধান কোন্ বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে অন্যায়-প্রমত্ততা সঙ্কুচিত হইতে পারে, এবং একমাত্র ন্যায়পরায়ণ বিচারকের উদ্ভব হইতে পারে, তাহার তথ্যও মানুষ অনেকদিন হইতে ভুলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু কিছুদিন আগেও যাঁহারা প্রকাশ্যভাবে সাধনাহীন অথবা চরিত্রহীন, অথবা রাগ দ্বেষ-যুক্ত, অথবা দ্বন্দ্ব-কলহ-প্রমত্ত, অথবা অভিমানী, অথবা স্বার্থ-পরায়ণ হইতেন, তাঁহারা কি সমাজের, অথবা কি রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় হইয়া দায়িত্ব গ্রহণ করিবার বিশ্বাস লাভ করিতে পারিতেন না। যাঁহারা ব্যভিচারী অথবা

ব্যভিচারিণী হইতেন, তাঁহারা যতই গুণসম্পন্ন হউন না কেন, তাঁহাদের পক্ষে সমাজের অথবা রাষ্ট্রের শীর্ষস্থান লাভ করা তো দূরের কথা, পরিত্যক্ত ও পরিত্যক্তা হইয়া সমাজের ও রাষ্ট্রের অন্তরালে দিন যাপন করিতে হইত। ৩০।৪০ বৎসর আগে যাঁহারা সমাজের ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই যে সাধক, চরিত্রবান্, রাগ-দ্বেষ-বিমুক্ত দ্বন্দ্ব ও কলহ প্রবৃত্তিহীন, অভিমানশূন্য ও নিঃস্বার্থ কর্ম্মী ছিলেন, ইহা বলা চলে না বটে, কিন্তু যাঁহারা উহার বিপরীত আচরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে লুকায়িতভাবে তাহা করিতে হইয়াছে।

আর আজকাল যাঁহারা সমাজের ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে সাধনা-বিহীনতা, চরিত্রবিহীনতা, রাগ-দ্বেষ-যুক্ততা, দ্বন্দ্ব-কলহ-প্রমত্ততা, অভিমানগ্রস্ততা, স্বার্থ-পরায়ণতা, অসত্যবাদিতা নাই, প্রায়শঃ এমন একজনও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। প্রকাশ্যে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীগণ অনায়াসে ও অসঙ্কোচে সমাজের ও রাষ্ট্রের বুকের উপর দাঁড়াইয়া নেতৃত্ব করিয়া যাইতেছেন। ইহাঁদিগকে দেখিয়া মনে হয়, যেন প্রকাশ্যভাবে বিপরীত চালচলনই আধুনিক নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণ (qualification) হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এইরূপভাবে মানুষের শান্তি ও সন্তুষ্টি বিদূরিত হইয়া অশান্তি ও অসন্তুষ্টি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি ও অসন্তুষ্টি যে যে ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনায় দূরীভূত হইতে পারে, তাহা গ্রহণ না করিয়া অধুনা মানুষগুলি যেরূপ বিপরীতভাবে চলিতেছে, সেইরূপ বিপরীতভাবে চলিতে থাকিলে অদূর-ভবিষ্যতে ভারতীয় মনুষ্যসমাজ কোন্ অবস্থায় উপনীত হইতে পারে, আমরা এক্ষণে তাহার চিত্র উদ্ঘাটিত করিবার চেষ্টা করিব।

উপরোক্ত চিত্র অঙ্কিত করিবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় মনুষ্য-সমাজকে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নামে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। কিছুদিন আগেও ভারতীয় শিক্ষিত সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের বস্তু ছিলেন ভারতীয়

নারী। ঐ ভারতীয় নারীকে কেন্দ্র করিয়া ভারতীয় শিক্ষিত পরিবার ও ভারতীয় শিক্ষিত সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই নারীকে আশ্রয় করিয়া কিছুদিন আগেও ভারতীয় পুরুষগণ শ্রমক্লিষ্ট ও অশান্তিদগ্ধ জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিতেন। কিন্তু, এক্ষণে আমরা যে ভাবে চলিতেছি এবং আমাদিগের নারীগণকে চালাইতেছি, তাহাতে ইহাঁরাই প্রায় প্রত্যেক শিক্ষিত পরিবারের সর্ব্বাপেক্ষা অশান্তি ও ক্লেশের কারণ হইয়া দাঁড়াইবেন। ভারতীয় শিক্ষিত পরিবার বলিতে যাহা বুঝা যাইত তাহা সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট হইয়া যাইবে এবং আমাদিগকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া উচ্ছৃঙ্খলভাবে দিন যাপন করিতে হইবে। ভারতীয় শিক্ষিত পরিবারস্থ নারীগণের যে সতীত্বের খ্যাতি একদিন সারা জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহা উপকথার মত হইয়া দাঁড়াইবে। মাতৃস্বরূপ, যে নারীগণ একদিন নিতান্ত ঘৃণ্যকেও আশ্রয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই, যাঁহারা নিজদিগের চরিত্র-বলে চরিত্রহীন পতি-পুত্রকে চরিত্রবান্ করিয়া তুলিতে পারিতেন, সেই নারীগণ প্রায়শঃ চরিত্রহীনা হইয়া সমাজের স্কন্ধে ভারস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবেন।

যাঁহারা বংশপরম্পরায় কোন দিন নফরগিরী করেন নাই, সাধুতা, সত্যবাদিতা ও আতিথিপরায়ণতা যাঁহাদের প্রত্যেকের প্রতি চালচলনে ফুটিয়া বাহির হইত, তাঁহারা পেটের দায়ে কর্ম্ম ও কুকর্ম্মের মধ্যে কোন পার্থক্য বজায় রাখিবেন না।

যাঁহারা অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও পরের কাছে যাচ্ঞা করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন, তাঁহারা যাচ্ঞায় কোন সঙ্কোচ বোধ করা তো দূরের কথা, পেটের দায়ে পরের গলায় ছুরী মারিতেও কুণ্ঠা বোধ করিবেন না।

যাঁহারা পরের কাছে দায়গ্রস্ত হইতে অথবা উপকার গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠা বোধ করিতেন, তাঁহারা প্রতারণার দ্বারা পরস্বাপহরণ করিতে দ্বিধা বোধ করিবেন না।

প্রায় প্রত্যেক শিক্ষিত মানুষটি এক একটি দাস হইয়া পড়িবেন।

স্ত্রী, ভগ্নী ও কন্যার ব্যভিচার, পুত্র ও ভ্রাতার প্রতারণা, অনাহার ও

ব্যাধিক্লেশ নীরবে সহ্য করিতে হইবে এবং সময় সময় যাঁহারা অনুগৃহীত ও আশ্রিত, তাহাদের হস্তে প্রহার খাইতে হইবে।

বিধির বিধানানুসারে ভারতীয় মানুষগণকে রক্ষা করিবার জন্য হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ইংরেজ, ও ভারতীয়গণের মিলনে যে কংগ্রেস মিলন-মণ্ডপরূপে রচিত হইয়াছিল, সেই কংগ্রেস একটি প্রকাণ্ড দ্বন্দ্ব-কলহের আবাসস্থল হইয়া দাঁড়াইবে।

যাঁহারা আজ কংগ্রেসের নেতারূপে বিভিন্ন প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট রচনা করিতেছেন, ইহাঁদের অনেককেই অপঘাত-মৃত্যু সদৃশ জ্বালাযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। পরস্পরের মধ্যের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অধিকাংশ পরিমাণে তিরোহিত হইয়া যাইবে।

পাঠকগণের মধ্যে কেহ কেহ হয় ত আমাদের এই চিত্রের কথায় হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেছেন না। আমরা তাঁহাদিগকে আরও ৫।৬ বৎসর অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিতেছি। আমাদিগের শিক্ষিত সমাজ অতীব মহাপাপী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহাদিগের পাপের ফল তাঁহাদিগকে ভুগিতে হইবে। ইহার অন্যথা কখনও হইতে পারে না।

যাহারা অশিক্ষিত তাহারা নিরীহ এবং তাহারা প্রায়শঃ শিক্ষিতগণের মত অত মহাপাপী নহে। যে অশিক্ষিত শ্রমজীবিগণকে লইয়া আমাদিগের সোশ্যালিষ্ট নেতৃবৃন্দ তথাকথিত শ্রমজীবীর আন্দোলন চালাইতেছেন, আমরা তাঁহাদিগের কথা বলিতেছি না। তাঁহাদিগের পশ্চাদ্ভাগে এক সম্প্রদায় বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহারাই আমাদিগের ৩৬ কোটীর ২৮ কোটী। তাহারা অনেক সহ্য করিয়াছে। তিন বেলার স্থলে এক বেলা খাইয়াই তাহারা অদৃষ্টের দোহাই দিয়া নীরব রহিয়াছে। কিন্তু, এখন আর ঐ একবেলাও তাহাদিগের আহার জুটিতেছে না। কাযেই, আর সহ্য করিতে পারিতেছে না। আমাদিগের নেতৃবৃন্দের মৃত্যুবাণ তাহাদিগের বক্ষে লুকায়িত রহিয়াছে।

ক্ষুধার তাড়নায় তাহারা অদূর-ভবিষ্যতে ধেই ধেই করিয়া নাচিয়া

উঠিবে। যে বন্যা ও জলপ্লাবন এক্ষণে ভীষণাকারে দেখা দিতেছে, তাহা প্রতিবৎসর ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতে থাকিবে। কিছু দেনা অথবা কিছু খয়রাৎ প্রদান করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করা যাইবে না। তাহারা উহা সহ্য করিতে পারিবে না। নিরীহ ঐ বেচারীগণ ভগবানের যন্ত্রস্বরূপ। তথাকথিত শিক্ষিত মহাপাপী নীচ স্বার্থপরায়ণ মোড়লগণের দণ্ড উহাদের হাতে সম্পাদিত হইবে। তখন শিহরিয়া উঠিলেও রক্ষা পাওয়া যাইবে না। উহাদের হাতে নৃশংস ভাবে প্রাণাধিক পুত্রের দণ্ড ও প্রাণাধিকা কন্যার নির্য্যাতন দাঁড়াইয়া নীরবে লক্ষ্য করিতে হইবে। এই চিত্র অতীব ভীষণ। এই চিত্র যাহাতে সত্য না হয় তজ্জন্য আমরা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করিতেছি। তাই আমরা এখনও বলি, সাধু, এখনও সাবধান হও। এখনও পাশ্চাত্ত্য দলাদলির পলিটিক্স্ বাদ দিয়া, এখনও পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া মোড়লী করিবার প্রবৃত্তি বিসর্জ্জন দিয়া, দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তি অতিক্রম করিয়া মানুষের মত মানুষ কি করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে, সর্ব্বাগ্রে তাহার গবেষণায় প্রবৃত্ত হও।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবাসিগণের কর্ত্তব্য

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবাসিগণের কি কর্ত্তব্য, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে ভারতের অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ চিত্র প্রসঙ্গে যে-সমস্ত কথা বলা হইয়াছে, তাহা পরিষ্কার ভাবে সর্ব্বদা স্মরণ-পথে জাগ্রত রাখিতে হইবে; কারণ কোন্ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য, তাহা যথাযথভাবে নির্দ্ধারিত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে অবস্থাটি পূর্ব্বাপর ভাবে সঠিক রকমে পরিজ্ঞাত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়।

ঐ তিনটি চিত্র যথাযথভাবে মানস নেত্রে জাগ্রত করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, একদিন ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক মানুষটি ভারতীয় ঋষিগণের উপদেশগুলি প্রায়শঃ সম্যক্ ভাবে বুঝিতে পারিতেন এবং

সশ্রদ্ধভাবে উহা বর্ণে বর্ণে পালন করিতেন। তখন ভারতবাসিগণের মধ্যে কোন মতদ্বৈধতা বিদ্যমান ছিল না এবং তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ ছিলেন। যখন মানুষ সর্ব্ববিষয়ের সত্যগুলি সম্যক্ ভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারে, তখনই এইরূপ সর্ব্বতোভাবের ঐক্যবন্ধন সম্ভবযোগ্য হয়। সত্য ভুলিয়া গিয়া মানুষ যখন অসত্যকে সত্য বলিয়া কার্য্যে পরিণত করিতে, অথবা প্রমাণিত করিতে চাহে, তখন মানুষের পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও কলহ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

ভারতীয় ঋষিগণের মূলগ্রন্থগুলি এখনও যথাযথভাবে অধ্যয়ন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহারা সর্ব্ববিষয়ক সমস্ত সত্য আমূলভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছিলেন। সমগ্র জগতের প্রত্যেক শ্রেণীর জীবের উৎপত্তি কিরূপভাবে হয় এবং ভ্রূণ অথবা বীজরূপে উৎপত্তির পর প্রত্যেক জীবের গঠনে ও কাযকর্ম্মে জটিলতা কিরূপভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়, তাহা যেরূপ তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিলেন, সেইরূপ আবার যে মূল কারণ বশতঃ জীবের উৎপত্তি এবং জীবের শরীর-গঠনে ও কাযকর্ম্মে জটিলতা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে, সেই মূল কারণের উদ্ভব, বৃদ্ধি ও সৃষ্টিশক্তির উন্মেষ কি করিয়া হয়, তাহাও তাঁহারা স্থির করিতে পারিয়াছিলেন। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উপরোক্ত দুইটি দিক্কে তাঁহারা যথাক্রমে "ব্রহ্মরূপ" ও "জগদ্রূপ" অথবা "ঈশ্বররূপ" ও "মানুষরূপ" বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। অথর্ব্ববেদ, অথবা দুইটি মীমাংসা, অথবা চারিটি দর্শন যথাযথভাবে অধ্যয়ন করিতে পারিলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপরোক্ত দুইটি দিক্ সম্যক্ভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। যাঁহারা ঐ বেদ অথবা মীমাংসা, অথবা দর্শনে প্রবিষ্ট হইবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা মহাভারতান্তর্গত "গীতা"র বিশ্বরূপ-দর্শনাধ্যায় উপলব্ধি করিতে পারিলেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে উপরোক্ত ভাবের দুইটি দিক্ আছে এবং দুইটি দিক্ই যে ঋষিগণ সম্যক্ভাবে অবগত হইতে

পারিয়াছিলেন, তাহার আভাস পাইবেন। এইরূপ ভাবে সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় সমস্ত সত্য তাঁহারা আমূলভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই সমাজ-পরিচালনার জন্য যে-সমস্ত বিধি ও নিষেধ সংহিতাকারে তাঁহাদিগের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেকটি প্রত্যেক মানুষের পক্ষে সশ্রদ্ধভাবে পালন করা এবং তদ্দ্বারা সুফল লাভ করা অনায়াসসাধ্য হইয়াছিল। তাঁহাদিগের কোন বিধি অথবা নিষেধ আংশিকভাবেও বিপরীত-ফলপ্রদ হইতে পারে নাই। সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় সমস্ত সত্য আমূলভাবে পরিজ্ঞাত না হইয়া কোন বিধি-নিষেধ অথবা আইন প্রণয়ন করিলে মানুষের পক্ষে উহা সর্ব্বতোভাবে পালন করা সম্ভবযোগ্য হয় না এবং উহা সময় সময় ঈপ্সিত ফল প্রদান করিলেও সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে সুফল প্রদান করে না। কি করিয়া সমাজের প্রত্যেক মানুষ আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারে তাহার সর্ব্বাঙ্গীন ব্যবস্থা সাধন না করিয়া মানুষকে চুরি ও প্রবঞ্চনা হইতে বিরত থাকিবার উপদেশ প্রদান করিলে, কথঞ্চিৎ পরিমাণে সুফল লাভ করা সম্ভব হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু প্রত্যেক মানুষের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে চুরি ও প্রবঞ্চনার দায় হইতে অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব হয় না। ঋষিদিগের প্রত্যেক বিধি ও নিষেধটি প্রত্যেক মানুষের পক্ষে সশ্রদ্ধভাবে পালন করা এবং তদ্দ্বারা সুফল লাভ করা সম্ভবযোগ্য হইয়াছিল বলিয়াই তৎকালে মানুষের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে ঐক্য সংঘটিত হইতে পারিয়াছিল।

ভারতীয় ঋষিগণের সংগঠনানুসারে সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সত্যোপলব্ধি করা, বিধি ও নিষেধ স্থির করা, অথবা আইন প্রণয়ন করা, শিক্ষার প্রণালী ও ব্যবস্থা প্রণয়ন করা এবং আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য অর্জ্জন করিবার প্রণালী ও ব্যবহার-পরিকল্পনা স্থির করার দায়িত্ব ছিল ব্রাহ্মণগণের।

ব্রাহ্মণগণ যে সমস্ত বিধি ও নিষেধ এবং ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতেন,

তৎসম্বন্ধে শ্রমজীবিগণ যাহাতে শিক্ষিত হন এবং উহা পালন করিতে যাহাতে তাহাদের কোন ক্লেশ অথবা অসুবিধা না হয়, তদনুরূপ কার্য্য করিবার দায়িত্ব ছিল বৈশ্যগণের।

উপরোক্ত বিধি ও নিষেধ এবং ব্যবস্থা পালন করিতে যাঁহারা তাচ্ছীল্য করিতেন, অথবা তাচ্ছীল্য করিবার সহায়তা করিতেন, তাঁহারা যাহাতে দণ্ড প্রাপ্ত হন, তাহার দায়িত্ব ছিল ক্ষত্রিয়গণের।

যে সমস্ত ব্যবস্থায়, অথবা প্রণালীতে সমাজের প্রত্যেকের আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা কার্য্যে পরিণত করিবার দায়িত্ব ছিল শূদ্র অথবা শ্রমজীবিগণের।

যাঁহারা মনুসংহিতা পড়িয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয় ত আমাদিগের উপরোক্ত কথায় আপত্তি উত্থাপিত করিবেন। কিন্তু, শব্দের প্রত্যক্ষ-বৃত্তি, পরোক্ষ-বৃত্তি এবং অতিপরোক্ষ-বৃত্তি কাহাকে বলে, তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া বাক্যের অর্থগ্রহণ করিবার পদ্ধতি অবগত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, আমরা মনুসংহিতার কথাই বলিতেছি এবং যাঁহারা ঐ বিষয় অপর কোন অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহারা উহার মর্ম্ম যথাযথ ভাবে উদ্ধার করিতে সক্ষম হন নাই।

এইরূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র, এই চারি শ্রেণীর মানুষ উপরোক্ত চারি শ্রেণীর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া সমাজের সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিতেন এবং তখন প্রত্যেক মানুষটী প্রয়োজনানুরূপ অর্থ, স্বাস্থ্য, শান্তি ও সন্তুষ্টি উপার্জ্জন করিতে পারিত।

তখনকার দিনে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র, এই চারি শ্রেণীর মানুষকে বিষয়বিশেষে পরস্পরের নির্দ্দেশ মানিয়া চলিতে হইত বটে, কিন্তু কোন শ্রেণীর মানুষই অপর কোন শ্রেণীর মানুষকে নীচ বলিয়া অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। বৈজ্ঞানিক সত্য প্রভৃতি বিষয়ে ব্রাহ্মণ আবিষ্কর্ত্তা ও প্রণেতা ছিলেন বলিয়া অন্যান্য শ্রেণীর শ্রদ্ধাভাজন

ছিলেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ পরিবারকেও জীবিকানির্ব্বাহের জন্য শূদ্রের উপর নির্ভরশীল থাকিতে হইত। ব্রাহ্মণ যেমন অপর তিন শ্রেণীর প্রয়োজনীয় ছিলেন, সেইরূপ অপর তিন শ্রেণীও ব্রাহ্মণের প্রয়োজনীয় ছিলেন।

ঋষিগণের সংগঠনে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, তখনকার দিনে বংশপরম্পরায় কেহ ব্রাহ্মণ, অথবা ক্ষত্রিয়, অথবা বৈশ্য, অথবা শূদ্র হইতে পারিত না।

ব্রাহ্মণের বংশে জন্মগ্রহণ করিলেই যে, ব্রাহ্মণ হওয়া যাইত, অথবা ক্ষত্রিয়-বংশে জন্মগ্রহণ করিলেই যে ক্ষত্রিয় হওয়া যাইত, অথবা বৈশ্যের বংশে জন্মগ্রহণ করিলেই বৈশ্য হওয়া যাইত, অথবা শূদ্রের বংশে জন্ম-গ্রহণ করিলেই শূদ্র হইতে বাধ্য হইতে হইত, তাহা নহে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, অথবা শূদ্র হইতে হইলে প্রত্যেক শ্রেণীর নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম-ক্ষমতা ও গুণ অর্জ্জন করা একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। উহা অর্জ্জন করিতে না পারিলে, অথবা উহা অর্জ্জন করিবার সম্ভাবনা না থাকিলে, ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণ-সন্তানকে ক্ষত্রিয়, অথবা বৈশ্য, অথবা শূদ্রের দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হইত। আবার শূদ্রবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া, ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য-শক্তি ও গুণ অর্জ্জন করিতে পারিলে অথবা উহা অর্জ্জন করিবার সম্ভাবনা দেখা গেলে, শূদ্রের সন্তান ব্রাহ্মণের দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে পারিত।

আর্থিক অভাব দূর করিবার জন্য তখন প্রধানতঃ পাঁচটি উপায় পরিগৃহীত হইত। ঐ পাঁচটি উপায়ের নাম—(১) কৃষি, (২) শিল্প, (৩) বাণিজ্য, (৪) চাকুরী, এবং (৫) প্রতিগ্রহ।

জমির উৎপাদিকাশক্তি যাহাতে অটুট থাকে এবং কৃষক যাহাতে কৃষিকার্য্যের দ্বারা লাভবান্ হইয়া দৈনন্দিন জীবনে কোনরূপ আর্থিক ক্লেশ ভোগ না করে, তাহা ছিল কৃষি-ব্যবসায়ের প্রধান দায়িত্ব। কি কি করিলে জমির উৎপাদিকাশক্তি অটুট থাকিতে পারে, তাহার

বিজ্ঞান ও নির্দ্দেশ আবিষ্কার করিবার দায়িত্ব ছিল ব্রাহ্মণগণের। জমির উৎপাদিকাশক্তির অটুটতা রক্ষাবিষয়ে ব্রাহ্মণগণ যে বিজ্ঞান ও নির্দ্দেশ আবিষ্কার করিতেন, তদনুসারে যাহাতে কার্য্য হয় এবং তাহা পরিদর্শন করিবার এবং ঐ সমস্ত কার্য্যের মধ্যে যাহা যাহা দৈহিক শ্রম-সাধ্য, তাহা শ্রমজীবিগণকে শিখাইবার ও তদনুসারে কার্য্য করাইবার দায়িত্ব ছিল বৈশ্যগণের। ব্রাহ্মণগণের আবিষ্কৃত কৃষি-বিষয়ক বিজ্ঞান ও নির্দ্দেশ যাঁহারা প্রতিপালন না করেন, তাঁহারা যাহাতে দণ্ডপ্রাপ্ত হন, তাহার দায়িত্ব ছিল ক্ষত্রিয়গণের। কায়িক শ্রমসাধ্য যে যে কার্য্য কৃষিবিষয়ে করিবার প্রয়োজন হয়, তাহার দায়িত্ব ছিল শূদ্র অথবা শ্রমজীবিগণের। এইরূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র, এই চারি শ্রেণীর মানুষ মিলিত হইয়া, কৃষক যাহাতে কৃষিকার্য্যের দ্বারা লাভবান্ হইয়া দৈনন্দিন জীবনে কোনরূপ আর্থিক ক্লেশ ভোগ না করে, তাহার ব্যবস্থা সম্পাদন করিতেন। কৃষকগণকেও শূদ্রই বলা হইত। জমীদার ও জোতদারগণ বৈশ্য শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। যাঁহারা আজকাল ভদ্র কায়স্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বৈশ্য শ্রেণীর অন্তর্গত এবং প্রধানতঃ জমিদার ও জোতদার। কৃষি-ব্যবসায়ী সমগ্র শূদ্র ও বৈশ্যগণ একমাত্র কৃষি-কার্য্যের দ্বারাই দৈনন্দিন আর্থিক প্রয়োজন সাধন করিয়া বার মাসে তের পার্ব্বণে যোগদান করিতে পারিতেন।

জমির উৎপাদিকাশক্তি যাহাতে অটুট থাকে, তৎসম্বন্ধীয় তাৎকালিক বিজ্ঞান অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতীয় ঋষিগণের মতানুসারে উহার একমাত্র উপায় নদী ও খাল প্রভৃতি জলাশয়ে যাহাতে বারমাস বালুকাস্তর পর্য্যন্ত জল থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা। যাঁহারা মনুসংহিতা পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, মনুসংহিতার কথানুসারে বৈশ্যগণের প্রধান কার্য্য তিনটি, যথা, (১) কৃষি, (২) পশুরক্ষা, (৩) বাণিজ্য। আজকালকার সংস্কৃত-পাঠকগণ প্রায়শঃ মনে করেন যে, 'পশুরক্ষা' এই শব্দটির অর্থ পশুকে রক্ষা করা। কিন্তু, তাহা

ঠিক নহে। শব্দের অতি-পরোক্ষ-বৃত্তি (অর্থাৎ মর্ম্মার্থানুসারে) 'পশু' শব্দের অর্থ 'জন্তু' হয় বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষ-বৃত্তি (অর্থাৎ অক্ষরগত অর্থানুসারে) 'পশু' শব্দের অর্থ 'জন্তু' হয় না। শব্দ-স্ফোট পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, শব্দের প্রত্যক্ষ-বৃত্তি অনুসারে উহার অর্থ হয় 'মৃত্তিকার জ্যোতি ও সরসতার ব্যবস্থা'। বাক্য, অথবা পদের অর্থ স্থির করিতে হইলে কোথায় শব্দের প্রত্যক্ষ-বৃত্তি অনুসরণ করিতে হইবে, আর কোথায়ই বা উহার পরোক্ষ-বৃত্তি, অথবা অতি-পরোক্ষ বৃত্তি অনুসরণ করিতে হইবে, তাহারও নির্দ্দেশ ঋষিগণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বেদাঙ্গান্তর্গত 'নিরুক্তে'র উপোদ্ঘাতাধ্যায়েব সূত্রগুলি যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে ঐ নির্দ্দেশ সঠিক ও সবিস্তৃত ভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব হয়। অবশ্য, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বেদাঙ্গান্তর্গত 'নিরুক্তে'র উপোদ্ঘাতাধ্যায়ের সূত্রগুলি যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা অতীব উচ্চ-সাধনাসাধ্য। শব্দের ব্রহ্মত্ব কোথায় তাহা উপলব্ধি করিতে না পারিলে ঐ সূত্রগুলি যথাযথ-ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবযোগ্য নহে। পরবর্ত্তী "ভট্ট" ও "আচার্য্য" প্রভৃতি পণ্ডিতগণের অনেকেই ঐ সাধনায় প্রবৃত্ত না হইয়া এবং শব্দের ব্রহ্মত্ব কোথায়, তাহা উপলব্ধি না করিয়া ঋষি-প্রণীত নিরুক্তের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং হৃদয়-বিদারকভাবে মানুষের বিপথ-গামিতার সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা ঐ উচ্চ সাধনায় পরাঙ্মুখ, তাঁহাদিগের পক্ষে নিরুক্তের উপরোক্ত সূত্রগুলি যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা অসাধ্য হইলেও, নন্দিকেশ্বরের লিঙ্গধারণ-চন্দ্রিকায় প্রবিষ্ট হইতে পারিলে কোন্ পদে ও বাক্যে শব্দেব প্রত্যক্ষবৃত্তি গ্রহণ করিয়া, আর কোথায়ই বা উহার পরোক্ষবৃত্তি অথবা অতিপরোক্ষবৃত্তি গ্রহণ করিয়া পদ ও বাক্যের অর্থোদ্ধার করিতে হইবে, তাহা সংক্ষেপতঃ মোটামুটি-ভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। 'জ্যোতির্লিঙ্গানুসন্ধানরূপ অন্তর্লিঙ্গধারণ-প্রতিপাদনং' আর 'ইষ্টলিঙ্গরূপ বাহ্যলিঙ্গধারণপ্রতিপাদনং', এই দুইটি

সূত্রে ঐ সম্বন্ধে অনেক কথা লিপিবদ্ধ আছে। ঐ দুইটি সূত্র বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, মনুসংহিতায় যে প্রসঙ্গে 'পশু-রক্ষা' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই প্রসঙ্গে শব্দের 'পরোক্ষ-বৃত্তি' অথবা অতি-পরোক্ষ-বৃত্তি' গ্রহণ করিলে বাক্যার্থ নিয়ম-বিরুদ্ধভাবে গৃহীত হয় এবং উহা দুষ্ট হইয়া পড়ে। ঐ প্রসঙ্গের অর্থ গ্রহণ করিবার একমাত্র উপায় শব্দের প্রত্যক্ষ-বৃত্তি গ্রহণ করা। শব্দের এই বৃত্তিত্রয় এবং তাহার কোন্‌টি কোথায় প্রযোজ্য, তাহা না জানার ফলে শুধু যে মনুসংহিতার ঐ স্থানটিই দুষ্টার্থে ব্যাখ্যাত হইতেছে তাহা নহে, সমগ্র মনুসংহিতাটি এবং ঋষি-প্রণীত প্রত্যেক গ্রন্থখানি বিরুদ্ধার্থে প্রচারিত হইতেছে এবং মানুষ উহা পড়িয়াও ঋষি-প্রণীত বিজ্ঞান ও ব্যবস্থা যথাযথভাবে জানিতে পারিতেছে না; পরন্তু, সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কথাকে ঋষির কথা বলিয়া মনে করিতেছে। এই বিপদ্ হইতে মানব-সমাজকে রক্ষা করিতে হইলে যাহাতে বর্ত্তমান সংস্কৃতাধ্যাপকগণ তাঁহাদের অধ্যাপনা এবং প্রচার হইতে অনতিবিলম্বে প্রতিনিবৃত্ত হন এবং তাঁহারা যাহাতে সম্মানিত পদ হইতে বিতাড়িত হন, তাহার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়।

মনুসংহিতা যথাযথ অর্থে পড়িতে পারিলে যেরূপ দেখা যায় যে, মৃত্তিকার জ্যোতি ও সরসতার ব্যবস্থা রক্ষা করিবার দায়িত্ব বৈশ্যগণের, সেইরূপ আবার কোন্ উপায়ে মৃত্তিকার জ্যোতি ও সরসতা ব্যবস্থিত হইতে পারে, তাহার বিজ্ঞান পরিজ্ঞাত হইতে হইলে অথর্ব্ববেদ পড়িবার প্রয়োজন হয়। এই বিজ্ঞান বাইবেল্ এবং কোরাণেও লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। ঋষি-প্রণীত এই বিজ্ঞান পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি অটুট রাখিবার একমাত্র উপায়—নদী ও খাল প্রভৃতি প্রত্যেক জলাশয়ে যাহাতে বার মাস বালুকান্তর পর্য্যন্ত জল থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা। ইহা ছাড়া এতদ্বিষয়ে আর যে-সমস্ত পরিকল্পনা

মানুষের মনে উদিত হইতে পারে, তাহার প্রত্যেকটি বিচার করিয়া ঋষিগণ দেখাইয়াছেন যে, উহার কোনটি হইতেই সর্ব্বাঙ্গীন সুফলোদয় হওয়া সম্ভব নহে। ঋষিগণের এই বিচারগুলি অনুধাবন করিতে পারিলে বুঝা যাইবে যে, বর্ত্তমান বিজ্ঞানানুসারে ইয়োরোপ, অ্যামেরিকা, অ্যাফ্রিকা এবং অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে জমির উর্ব্বরা-শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য যে যে উপায় গৃহীত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি স্বভাব-বিরুদ্ধ এবং উহার ফলে জমি হইতে ঐ ঐ দেশে যে-সমস্ত ফসল উৎপন্ন হয়, তাহার প্রত্যেকটি মানুষের আহার ও ব্যবহার-কার্য্যে অস্বাস্থ্যকর। সাদা ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, বর্ত্তমান বিজ্ঞানানুসারে জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য যে যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে, তাহার ফলে যে যে ফসল উৎপন্ন হয়, তাহা আহার অথবা ব্যবহার করিলে মানুষ আস্তে আস্তে বিষক্রিয়া-সংযুক্ত হইয়া পড়ে। প্রধানতঃ ইহারই জন্য সর্ব্বদেশে সারা মানব-সমাজের মধ্যে ক্ষয়-রোগ এতাদৃশ পরিমাণে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

নদী ও খাল প্রভৃতি প্রত্যেক জলাশয়ে যাহাতে বার মাস মৃত্তিকার সর্ব্বনিম্ন বালুকাস্তর পর্য্যন্ত জল থাকে, তাহার ব্যবস্থা সাধন করিতে পারিলে শুধু যে জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং কৃষি-ব্যবসায়ী বৈশ্য ও শূদ্র জনসাধারণের অর্থাভাব দূরীভূত হয়, তাহা নহে। উহার দ্বারা দেশের জল ও বায়ু অধিকতর স্নিগ্ধতা প্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্বসাধারণের স্বাস্থ্যও অপেক্ষাকৃত উন্নতি লাভ করে। এইরূপে, ঐ একই কার্য্যের দ্বারা সমাজের অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব বিদূরিত করিবার সহায়তা ঘটে।

জমির উর্ব্বরাশক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলে যে শুধু কৃষি-ব্যবসায়ী বৈশ্য ও শূদ্র জনসাধারণের অর্থাভাব দূর হয়, তাহা নহে, শিল্প ও বাণিজ্য-ব্যবসায়ী মানুষের ব্যবসাও অপেক্ষাকৃত অনেক পরিমাণে অনায়াসসাধ্য হয়।

আধুনিক শিল্প ও বাণিজ্য-ব্যবসায়িগণ প্রায়শঃ কেন লোকসানগ্রস্ত হইয়া থাকেন, তাহার অনুসন্ধান করিলে আমাদিগের উপরোক্ত কথার সত্যতা সহজেই বুঝা যাইবে। ঐ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, আধুনিক শিল্প ও বাণিজ্য-ব্যবসায়িগণের লোকসানগ্রস্ততার প্রধান কারণ দুইটি ; যথা,—

(১) ক্রেতাগণের ক্রয়শক্তির অভাব, এবং

(২) সর্ব্বত্র শ্রমজীবিগণের অসন্তুষ্টি ও তাহাদের মজুরী-বৃদ্ধির দাবী।

ক্রেতাগণের ক্রয়শক্তির অভাববশতঃ বিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণ যেরূপ হ্রাস পাইতেছে, সেইরূপ আবার চাহিদার অল্পতা বশতঃ বিক্রয়-মূল্যের হারও শিল্প ও বাণিজ্য-ব্যবসায়িগণ উত্তরোত্তর কমাইতে বাধ্য হইতেছেন। অন্যদিকে, সর্ব্বত্র শ্রমজীবিগণের অসন্তুষ্টি ও তাহাদের মজুরী-বৃদ্ধির দাবী উত্থাপিত হওয়ায়, দ্রব্য-উৎপাদনের খরচার হার বৃদ্ধি পাইতেছে। এইরূপে, একদিকে খরচের হারের বৃদ্ধি, অন্যদিকে বিক্রয়-মূল্যের হারের অল্পতা বশতঃ শিল্প ও বাণিজ্যে লাভের হার ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে।

ক্রেতাগণের ক্রয়-শক্তির অভাব কেন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, ভারতবর্ষের মোট লোকসংখ্যার শতকরা প্রায় নব্বই জন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভরশীল। জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পাইলে, কৃষকগণের পক্ষে অল্লায়াসে প্রচুর শস্যোৎপাদন করা সম্ভব হয় এবং তখন তাহাদিগের উপার্জ্জন বৃদ্ধি পায় ও দারিদ্র্য অনেকাংশে ঘুচিয়া যায়। অন্যদিকে জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি হ্রাস পাইলে, কৃষি-কার্য্য অপেক্ষাকৃত অধিকতর আয়াস ও খরচাসাধ্য হইয়া পড়ে এবং তখন অত্যধিক পরিশ্রম করিয়াও প্রচুর পরিমাণে শস্যোৎপাদন করা অসম্ভব হয়। সুতরাং কৃষিজীবিগণের উপার্জ্জন কমিতে আরম্ভ করে এবং তাহাদিগের দারিদ্র্য

উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। বর্ত্তমান সময়ে জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি উত্তরোত্তর হ্রাস পাইতেছে বলিয়াই ভারতবাসী কৃষিজীবিগণের অর্থাভাবও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে এবং তাহাদের ক্রয়-শক্তিও উত্তরোত্তর কমিয়া যাইতেছে।

শ্রমজীবিগণের অসন্তুষ্টি ও তাহাদের মজুরী-বৃদ্ধির দাবী কেন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রধান কারণ দুইটি ; যথা,—

(১) তাহাদের অস্বাস্থ্যতার বৃদ্ধি, এবং

(২) অস্বাস্থ্যতার চিকিৎসা এবং আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের মূল্যের হারের বৃদ্ধিবশতঃ খরচার বৃদ্ধি।

অস্বাস্থ্যতার বৃদ্ধির জন্য তাহারা নিজের ও পরিবারের শরীর লইয়া প্রায়শঃ অসন্তুষ্ট থাকে। তাহার পর আবার ঐ অস্বাস্থ্যতার জন্য প্রয়োজনানুরূপ শ্রম করিতে অক্ষম হয় এবং ইহার ফলে উপার্জ্জনের হার কমিয়া যায়। ইহা ছাড়া অস্বাস্থ্যতার চিকিৎসা, আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের অপেক্ষাকৃত অধিকতর মূল্য বশতঃ তাহাদের খরচার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং বাধ্য হইয়া অধিকতর হারে মজুরীর দাবী উত্থাপন করে। তাহাদের অস্বাস্থ্যতার বৃদ্ধি কেন হইতেছে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, দেশমধ্যস্থিত নদী, খাল প্রভৃতি জলাশয়ে যাহাতে বার মাস জল থাকে, তাহার ব্যবস্থা থাকিলে জল-বায়ু স্নিগ্ধ হয় এবং প্রাকৃতিক কারণেই রোগের বীজাণু ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে থাকে। তাহাতে জনসাধারণের অস্বাস্থ্যের সম্ভাবনা কমিয়া যায়। তাহার পর আবার যদি জীবিকার্জ্জনের এমন ব্যবস্থা থাকে যে, উন্মুক্ত বায়ুতে অনায়াসসাধ্য কার্য্য করিয়া শ্রমজীবিগণের পক্ষে উহা অর্জ্জন করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের প্রায়শঃ অসুস্থ হইতে হয় না। অন্যদিকে নদী, খাল প্রভৃতি জলাশয়গুলি বছরের অধিকাংশ সময়ে শুষ্ক থাকিলে, দেশের জল-বায়ু অধিকতর উত্তপ্ত হইয়া পড়ে এবং

উহা সর্ব্বত্রই রোগের বীজাণুপরিপূর্ণ হয়। তাহার পর আবার যদি জীবিকার্জ্জনের জন্য তাহাদিগকে অনবরত বদ্ধ স্থানে অত্যধিক শ্রমসাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের রুগ্নতা অনিবার্য্য হয়।

প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ঋষিগণের অভ্যুদয়-কালে ভারতবর্ষের প্রত্যেক নদী ও খাল বার মাস জলে পরিপূর্ণ থাকিত এবং শ্রমজীবিগণের মধ্যে যাহারা কৃষিকার্য্য করিত, তাহারাই জমির অত্যধিক উর্ব্বরাশক্তি বশতঃ পাচ মাসের পরিশ্রমে অনায়াসে বার মাসের খোরাক সংগ্রহ করিতে পারিত বলিয়া, বাকী সাত মাস নানাবিধ কুটীর-শিল্পে মনোযোগী হইতে পারিত। কুটীর-শিল্পে কখনও বদ্ধ স্থানে বাস করিয়া অত্যধিক শ্রমসাধ্য কার্য্য করিবার প্রয়োজন হয় না। এইরূপে, তখনকার দিনে শিল্প ও বাণিজ্যের কার্য্যে কাহারও প্রায়শঃ অসুস্থ হইতে হইত না।

আর অধুনা, একে ত' নদী ও খাল প্রভৃতি জলাশয়সমূহ বৎসরের অধিকাংশ সময়ই শুষ্ক থাকে, তাহার পর আবার যন্ত্র-শিল্পের সংগঠনানুসারে শ্রমজীবিগণকে দিনভাগের অধিকাংশ সময়ই বদ্ধ স্থানে অবস্থান করিতে হয় এবং প্রতিনিয়ত যন্ত্রসমূহের কর্কশধ্বনির মধ্যে অতীব কষ্ট-সাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিতে হয়।

কাযেই দেখা যাইতেছে যে, নদী ও খাল প্রভৃতির শুষ্কতাবশতঃ এক দিকে দেশের জল-হাওয়া রোগের বীজাণু-পরিপূর্ণ হইয়া পড়িতেছে· এবং অন্য দিকে জমির অনুর্ব্বরতা বশতঃ কৃষিকার্য্য কষ্ট-সাধ্য ও লোকসান-জনক হওয়ায় মানুষকে বাধ্য হইয়া কুটীর-শিল্প পরিত্যাগ করিয়া যন্ত্র-শিল্প গ্রহণ করিতে হইতেছে ও তাহাদের অসুস্থতা বৃদ্ধি পাইতেছে।

আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের মূল্য কেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য-কার্য্য অনায়াসসাধ্য হইলে এবং উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি

পাইতে থাকিলে আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মূল্যের হ্রাস হওয়া অনিবার্য্য হয়। অন্য দিকে, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের কার্য্য অত্যধিক শ্রম-সাধ্য হইলে এবং উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ হ্রাস পাইতে থাকিলে আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস প্রকৃতভাবে অনুসন্ধান করিতে পারিলে জানা যাইবে যে, ঋষিদিগের অভ্যুদয়কাল হইতে ভারতবর্ষে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের কার্য্য অনায়াসসাধ্য ছিল এবং তখন উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণও এখনকার তুলনায় বহুগুণে বেশী ছিল। ফলে, কয়েকশত বৎসর আগেও নামমাত্র মূল্যে প্রত্যেক দ্রব্যের ক্রয় ও বিক্রয় সাধিত হইত। আর অধুনা কৃষি, কুটীরশিল্প ও বাণিজ্যের কার্য্য অত্যধিক শ্রমসাধ্য হইয়াছে এবং প্রত্যেক মানুষের উৎপন্ন দ্রব্যের হারও কমিয়া গিয়াছে বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্যের মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। কৃষি, কুটীরশিল্প ও বাণিজ্যের কার্য্য যে অত্যধিক শ্রমসাধ্য হইয়াছে, তাহার কারণ যে জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির হ্রাস তাহাও আমরা আগেই দেখাইয়াছি।

সুতরাং যুক্তি অনুসরণ করিলে ইহা বলা যাইতে পারে যে, জমির উর্ব্বরাশক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলে, শিল্প ও বাণিজ্য-ব্যবসায়ী মানুষের ব্যবসাও অপেক্ষাকৃত অনেক পরিমাণে অনায়াসসাধ্য হয়।

কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধে যে যে কথা বলা হইল, তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, নদী, খাল প্রভৃতি জলাশয়ে যাহাতে সর্ব্বনিম্ন বালুকাস্তর পর্য্যন্ত বারমাস জল থাকে, একমাত্র তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলেই, জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তখন যেরূপ কৃষি আয়াসসাধ্য হয়, সেইরূপ কুটীরশিল্প এবং বাণিজ্যও অনায়াসসাধ্য হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া দেশের জল-বায়ু স্নিগ্ধ হয় ও বাতাস হইতে রোগের বীজাণুর বিলুপ্তি ঘটে। এইরূপে নদী, খাল প্রভৃতি প্রত্যেক জলাশয়ে

যাহাতে সর্ব্বনিম্ন বালুকাস্তর পর্য্যন্ত বার মাস জল থাকে, একমাত্র তাহার ব্যবস্থা সাধিত করিতে পারিলে, একদিকে যেরূপ জনসাধারণের অস্বাস্থ্য প্রায়শঃ বিদূরিত হইতে পারে, সেইরূপ আবার কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য-ব্যবসায়িগণের আর্থিক প্রাচুর্য্য সম্পূর্ণভাবে সংঘটিত হইতে পারে।

ভারতীয় ঋষিগণ ঐ উপায়টি সম্যক্‌ভাবে পরিজ্ঞাত ছিলেন এবং ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ মিলিত হইয়া যাহাতে উহা পালন করে, তাহার ব্যবস্থা সংগঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে উহা সম্যক্‌ভাবে পরিজ্ঞাত ছিলেন এবং ইহা যাহাতে পালন করা হয়, তাহার ব্যবস্থা যে তাঁহারা সংগঠিত করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ তাঁহাদিগের প্রণীত অথর্ব্ববেদ ও মনুসংহিতা।

প্রধানতঃ এই উপায়টি আবিষ্কার করিবার জন্যই সম্পূর্ণ জীবতত্ত্ব (অর্থাৎ মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ প্রভৃতি জীবের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কোথা হইতে ও কিরূপ ভাবে হয়, তাহার তত্ত্ব) আমূলভাবে জানিবার প্রয়োজন হয়। তাহাতে ভারতীয় ঋষিগণ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ তাঁহাদিগের বেদান্ত, বেদ, মীমাংসা ও দর্শন।

ভারতীয় ঋষিগণের মতানুসারে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ছাড়া জীবিকার্জ্জনের আর দুইটি উপায়—চাকুরী এবং প্রতিগ্রহ।

নদী ও খাল প্রভৃতি প্রত্যেক জায়গায় যাহাতে বারমাস সর্ব্বনিম্ন বালুকাস্তর পর্য্যন্ত জল থাকে, তাহার ব্যবস্থা সাধিত করিতে পারিলে দেশের প্রত্যেকের রুগ্নতার কারণ বিদূরিত হয় বটে এবং তদ্দ্বারা কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের অনায়াসসাধ্যতা সম্পাদিত হইয়া ঐ ঐ ব্যবসায়ী বৈশ্য ও শূদ্রগণের আর্থিক প্রাচুর্য্যও সম্ভাবিত হইতে পারে বটে, কিন্তু ঐ তিনটি ব্যবসায় শ্রমজীবিগণের মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প শ্রম-শক্তি-ক্ষম, তাহাদিগের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নহে। ইহা ছাড়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ ঐ তিনটি ব্যবসায়ের কোনটি অবলম্বন করিলে তাহাদিগের মধ্যে অর্থলোলুপতার উদ্ভব হইতে পারে এবং কর্ত্তব্য-

বিমুখতা স্থান পাইতে পারে। এই আশঙ্কায়, শ্রমজীবিগণের মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প শ্রম-শক্তি-ক্ষম, তাহাদিগের জন্য চাকুরী ব্যবসায় এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের জন্য প্রতিগ্রহের সংগঠন সাধিত হইয়াছিল।

তৎকালে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য, এই তিনটি ব্যবসায় প্রকৃতভাবে স্বাধীন কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ব্যক্তিগতভাবে ঐ ঐ ব্যবসায়িগণকে ব্রাহ্মণ-প্রণীত অনেক বিধি ও নিষেধ পালন করিতে হইত বটে, কিন্তু কোন ব্যবসায়েই কোনরূপ শুল্ক অথবা কর প্রদান করিতে হইত না এবং কাহারও লাভালাভের জন্য বাজারের দরের উপর নির্ভরশীল হইতে হইত না। চাকুরী সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দনীয় কার্য্য ছিল। ব্যক্তিগত ভাবে চাকুরীয়া শূদ্রগণকে কাহারও অবজ্ঞা করা নিয়মবিরুদ্ধ ছিল বটে, কিন্তু উহাঁরা প্রত্যেকেই অপর কাহারও না কাহারও আদেশ পালন করিয়া পরাধীন জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইতেন।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ যখন তাঁহাদিগের কর্ত্তব্যনির্ব্বাহের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে কাহারও জীবন-রক্ষাকার্য্যে উপকার সাধন করিতে সক্ষম হইতেন, তখন উপকৃত স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের জীবিকানির্ব্বাহের জন্য যাহা প্রদান করিত, তাহা গ্রহণ করিবার কার্য্যের নাম ছিল প্রতিগ্রহ। কোনরূপ বিলাসভোগের কামনা-যুক্ত হইলে কাহারও পক্ষে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সম্মান লাভ করা সম্ভব হইত না, কারণ তাহা হইলে উভয়েরই দায়িত্ব নির্ব্বাহ করা অসাধ্য হইয়া উঠিত। বিলাসভোগের কামনা বর্জ্জন করিতে হইত বলিয়া, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পরিবারের জীবিকানির্ব্বাহের জন্য খুব অল্প বস্তুরই প্রয়োজন হইত। প্রতিগ্রহের নিয়মানুসারে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ খুব অল্প বস্তুই গ্রহণ করিতে পারিতেন। তাহাও যাহার তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করা অসাধ্য ছিল, কারণ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের দ্বারা যাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে জীবন-রক্ষাকার্য্যে উপকৃত হইতেন, একমাত্র তাঁহাদিগেরই দান উহাঁরা গ্রহণ করিতে পারিতেন এবং যাঁহারা

প্রত্যক্ষভাবে জীবনরক্ষা-কার্য্যে উপকৃত হইতেন, তাঁহারা কখনও অসাধু হইতে পারিতেন না। এই যে যৎসামান্য গ্রহণ, তাহাও ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণ কেহ স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া না দিলে যাজ্ঞা করিয়া লইতে পারিতেন না। অবশ্য, উপকৃত হইলে যাহাতে উপকারীকে দান করিবার প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়, তাহার শিক্ষা তৎকালে প্রত্যেককে দেওয়া হইত।

কোন উপকার হউক আর না-ই হউক, ডাক্তারগণ ও আইনব্যবসায়ী প্রভৃতিগণকে অধুনা যেরূপ তাঁহাদিগের নির্দ্দিষ্ট ফি প্রদান করিতে হয় এবং তাহা না করিলে উহা যেরূপ ডাক্তার ও আইনব্যবসায়িগণ আদায় করিয়া লইতে পারেন, তখনকার দিনে তাহা অসম্ভব ছিল। চিকিৎসায়, অথবা আইন ব্যবহারের কার্য্যে কোন উপকার না পাইলে কাহারও কিছু দিতে হইত না এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া কিছু না দিলে তাহা আদায় করা সম্ভব হইত না।

এইরূপে চারি শ্রেণীর মানুষ মিলিত হইয়া কৃষি প্রভৃতি পাঁচটি ব্যবসায়ের কার্য্যে অভিনিবিষ্ট হইলে, সমাজের প্রত্যেকের পক্ষে অর্থাভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে এবং স্বাস্থ্যাভাব হইতে আংশিকরূপে মুক্ত হওয়া সম্ভব হয়। অর্থাভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে এবং স্বাস্থ্যাভাব হইতে আংশিকরূপে মুক্ত হইতে পারিলে অশান্তির ও অসন্তুষ্টির মাত্রাও অনেকাংশে কমিয়া যায়। অর্থাভাব সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইলেও সমাজের মধ্যে অসচ্চরিত্রতাজনিত স্বাস্থ্যাভাব এবং অশান্তি ও অসন্তুষ্টির কারণ বিদ্যমান থাকে। উহা সম্যক্‌ভাবে দূর করিতে হইলে প্রয়োজন হয় আত্ম-তত্ত্বসম্বন্ধীয় শিক্ষা, কারণ স্বকীয় কর্ম্ম-শক্তি ও গুণের বিকাশ কিরূপে হয়, তাহা উপলব্ধি করিতে না পারিলে বিবিধ চরিত্রের উদ্ভব হয় কি করিয়া, তাহা জানা সম্ভব হয় না এবং অসচ্চরিত্রতা হইতে মুক্তি লাভ করাও সাধ্যায়ত্ত হয় না।

কাযেই দেখা যাইতেছে যে, সমাজের প্রত্যেকে যাহাতে অর্থাভাব,

স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি ও অসন্তুষ্টি হইতে সম্যক্‌ভাবে অব্যাহতি পাইয়া সুখে কাল-যাপন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা সাধন করিতে হইলে একদিকে যেরূপ চারি শ্রেণীর মানুষের মিলিত হইয়া কৃষি প্রভৃতি পাঁচটি অর্থাগমের কার্য্যে অভিনিবিষ্ট হইতে হয়, সেইরূপ আবার আত্ম-তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় শিক্ষারও প্রয়োজন হয়।

ঋষি-প্রণীত গ্রন্থগুলির মূলভাগ যথাযথ অর্থে অধ্যয়ন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ঋষিগণের অভ্যুদয়কালে উহার প্রত্যেক ব্যবস্থাটি যাহাতে প্রতিপালিত হয়, তদনুরূপ সংগঠন সাধিত হইয়াছিল এবং তখনকার দিনে ভারতবর্ষের প্রত্যেক মানুষটি সর্ব্বতোভাবের সুখে কাল-যাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

ঐ ব্যবস্থাগুলি যে শুধু ভারতবর্ষেই প্রতিপালিত হইত এবং শুধু ভারতবাসিগণের প্রত্যেকেই যে সর্ব্বতোভাবের সুখে কাল-যাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা নহে। ঋষিগণের গ্রন্থগুলির মূলভাগে যথাযথ ভাবে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, কি করিয়া জগতের প্রত্যেক দেশে ঐ ব্যবস্থাগুলি প্রচারিত হইতে পারে, তাহার চিন্তাও তৎকালে মানবহৃদয়ে স্থান পাইয়াছিল এবং ইহার ফলে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে সঙ্গে আরবী ও হিব্রু ভাষার বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ঐ দুইটি ভাষার সাহায্যে তখনকার দিনে জগতের প্রত্যেক দেশে ঋষি-প্রণীত প্রত্যেক ব্যবস্থা দৃঢ়ভাবে স্থান পাইয়াছিল এবং সমগ্র মানব-সমাজের প্রত্যেকে সর্ব্বতোভাবের সুখে কালযাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

যে ব্যবস্থাগুলির সাহায্যে একদিন সমগ্র মানবসমাজ এতাদৃশভাবে অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি এবং অসন্তুষ্টির হাত হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছিল, সেই ব্যবস্থাগুলি কেন নষ্ট হইল এবং কেনই বা প্রত্যেক মানুষটি আবার অর্থাভাবে, অথবা স্বাস্থ্যাভাবে, অথবা অশান্তিতে জর্জ্জরিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা আমরা

প্রথমভাগে "ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর অতীত এবং বর্ত্তমান চিত্রে" দেখাইয়াছি।

কি করিলে পুনরায় ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার প্রত্যেকের অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ও শান্তির অভাব সম্যক্‌ভাবে বিদূরিত হইতে পারে, তাহার আলোচনা করা আমাদিগের এই সন্দর্ভের প্রধান উদ্দেশ্য।

আজকালকার ভারতীয় নেতৃবর্গ যেরূপ বলিয়া থাকেন যে, স্বাধীনতা না হইলে ভারতবাসীর অর্থাভাব প্রভৃতি কিছুই দূর করা সম্ভব নহে, সেইরূপ বলা আমাদিগের মতে, কোনরূপ প্রকৃত কাযের কথা না বলার অনুরূপ। যখন নয় মণ তেল পুড়ান সহজসাধ্য নহে, তখন নয় মণ তেল না পুড়িলে রাধা নাচিবে না, এতাদৃশ উক্তির সমর্থন করা বর্ত্তমান নেতৃত্বের পক্ষে শোভনীয় হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে কাহারও অবস্থার কোনরূপ উন্নতি কথঞ্চিৎ পরিমাণেও সাধিত হইবে না। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান পরাধীন অবস্থায় যাহা যাহা করা ভারতবাসিগণের আয়ত্তাধীন এবং সহজসাধ্য, তাহার মধ্যে কি কি করিলে ভারতবাসিগণের প্রত্যেকের অর্থাভাব প্রভৃতি সম্যক্ পরিমাণে বিদূরিত হইবে, তৎসম্বন্ধীয় আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইব।

আমাদিগের মতে, ভারতবাসিগণের অর্থাভাব প্রভৃতি দূর করিবার জন্য যে যে পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে, সেই সেই পন্থায় অন্যান্য দেশের মানুষের অর্থাভাব প্রভৃতিও সম্যক্‌ভাবে বিদূরিত হইতে পারে। ভারতবাসিগণের অর্থাভাব প্রভৃতি বিদূরিত না হইলে অন্য কোন দেশের আর্থিক সমস্যা প্রভৃতি কোন সমস্যাই সম্পূর্ণভাবে সমাধান করা সম্ভব হইবে না, কারণ ভারতবাসিগণ আধুনিক পণ্ডিতগণের মতানুসারে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্দশাপন্ন হইলেও প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য দেশবাসীর মত ভারতবাসিগণের চরিত্রহীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা তত অধিক পরিমাণে মজ্জাগত হয় নাই। ইহা ছাড়া, অন্যান্য দেশের জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরতা যেরূপ ভাবে

নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং তাহার উন্নতিসাধন করা যেরূপ কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে, ভারতবর্ষের জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরতা এখনও তত অধিক পরিমাণে বিনষ্ট হয় নাই এবং তাহার উন্নতিসাধন করাও তত অধিক কষ্টসাধ্য নহে। বর্ত্তমান বিজ্ঞানে, ভারতবাসিগণের তুলনায় অন্যান্য দেশবাসিগণ অধিকতর উন্নতিলাভ করিয়াছেন তাহা সত্য, কিন্তু বর্ত্তমান বিজ্ঞান প্রকৃতপক্ষে মানুষের ধ্বংস-সাধন করিবার যত সহায়ক, তাহার শতাংশের একাংশ প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম নহে। প্রকৃত শব্দ-বিজ্ঞানের জ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারিলে বর্ত্তমান বিজ্ঞানকে কোন ক্রমেই বিজ্ঞান বলা চলে না। পরন্তু, উহাকে কু-জ্ঞান বলিতে হয়। সেইরূপ আবার বর্ত্তমান সভ্যতাকেও সভ্যতা বলা চলে না; পরন্তু অসভ্যতা অথবা পশুত্ব বলিতে হয়, কারণ উহার দ্বারা পশু-প্রবৃত্তির বৃদ্ধি সাধিত হইয়া থাকে।

কি করিলে পুনরায় ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার প্রত্যেকের অর্থাভাব প্রভৃতি সম্যক্‌ভাবে বিদূরিত হইতে পারে, তাহার সন্ধানে কৃতকার্য্য হইলে দেখা যাইবে যে, উহার উপায় একটির বেশী আর একটি নাই এবং আর একটি হইতে পারে না।

কোন্ কোন্ ব্যবস্থার দ্বারা উহা সম্পাদন করা সম্ভব, তাহার আলোচনায় আমরা দেখাইয়াছি যে, সমাজের প্রত্যেক মানুষ যাহাতে অর্থাভাব হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইতে পারে, তাহার উপায়, চারি শ্রেণীর মানুষের চারি রকমের কর্ত্তব্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়া মিলিতভাবে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করা এবং উহা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে দেশের নদী ও খাল প্রভৃতি প্রত্যেক জলাশয়ে যাহাতে বারমাস জল থাকে, তাহার ব্যবস্থা সাধন করিতে হয়। ইহা ছাড়া আরও দেখান হইয়াছে যে, সমাজের প্রত্যেকে যাহাতে স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি ও অসন্তুষ্টির হাত হইতে অব্যাহতি পায়, তাহা করিতে হইলে একদিকে যেরূপ উপরোক্ত

প্রথম ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ আবার প্রত্যেকে যাহাতে সাধ্যানুরূপ আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় শিক্ষা লাভ করিয়া প্রকৃত ভাবে চরিত্রবান্ হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়।

কাযেই বলিতে হইবে যে, ভারতবর্ষের প্রত্যেকে যাহাতে অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি ও অসন্তুষ্টির হাত হইতে সর্ব্বতোভাবে অব্যাহতি পায়, তাহা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়—ভারতবাসিগণের মিলন, দ্বিতীয় প্রয়োজন—ভারতবর্ষের চারিশ্রেণীর লোক যাহাতে চারি রকমের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা, তৃতীয় প্রয়োজন —ভারতবর্ষের নদী ও খাল প্রভৃতি প্রত্যক জলাশয়ে যাহাতে সর্ব্বনিম্ন বালুকাস্তর পর্য্যন্ত বার মাস জল থাকে তাহার ব্যবস্থা, চতুর্থ প্রয়োজন —যাহাতে চারি শ্রেণীর লোক মিলিত হইয়া কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিসাধনে অবহিত হয় তাহার ব্যবস্থা, পঞ্চম প্রয়োজন—প্রত্যেকে যাহাতে সাধ্যায়ত্তরূপে আত্ম-তত্ত্বসম্বন্ধীয় শিক্ষা লাভ করিয়া প্রকৃতভাবে চরিত্রবান্ হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা।

একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান পরাধীন অবস্থায় এই পাঁচটি ব্যবস্থার কোনটিই ভারতবাসিগণের কাহারও সম্পূর্ণ ইচ্ছানুরূপ ভাবে প্রবর্ত্তন করা সম্ভবযোগ্য নহে। কাযেই, আপাত-দৃষ্টিতে বলিতে হয় যে, স্বাধীনতা না হইলে ভারতবাসিগণের কোন দুঃখই সম্পূর্ণভাবে দূর করা সম্ভবযোগ্য নহে। অথচ, এই পরাধীন অবস্থাতেই ঐ পাঁচটি ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিবার পন্থা আবিষ্কার করিতে না পারিলে আমাদিগের উদ্দেশ্য সফল হইবে না।

সুতরাং ঐ পাঁচটি ব্যবস্থার কোন্‌টি এতাদৃশ অবস্থাতেও কথঞ্চিৎ পরিমাণে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, সর্ব্বাগ্রে তাহার সন্ধান করিতে হইবে।

এই সন্দর্ভের প্রারম্ভেই দেখান হইয়াছে যে, যখন সকল মানুষ সর্ব্ববিষয়ের সত্যগুলি সম্যক্‌ভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারে, তখন সর্ব্বতোভাবের মিলন সম্ভবযোগ্য হয়। সুতরাং ভারতবাসী সকলের

মধ্যে যাহাতে মিলন সংঘটিত হয়, তাহার কার্য্য করিতে হইলে ভারতবাসিগণ সর্ব্ববিষয়ের সত্যগুলি যাহাতে সম্যক্‌ভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন। সর্ব্ববিষয়ের সত্যগুলি পরিজ্ঞাত করাইতে হইলে সর্ব্ববিষয়ক প্রকৃত বিজ্ঞান আবিষ্কার করা আবশ্যক হয়। এতাদৃশ প্রকৃত বিজ্ঞান আবিষ্কার করা একে ত' সহজসাধ্য নহে, কারণ মহামানুষের আবির্ভাব না হইলে আর কাহারও দ্বারা প্রকৃত বিজ্ঞান উদ্ঘাটিত হয় না, তাহার পর আবার উহা আবিষ্কৃত হইলে জনসাধারণকে উহা পরিজ্ঞাত করান সময়সাপেক্ষ। ভারতবাসিগণ যেরূপ অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাবে জর্জ্জরিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার আশু প্রতীকার না হইলে তাহাদিগের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত হৃতশ্রী প্রাপ্ত হইবার আশঙ্কা আছে। এতাদৃশ অবস্থায় যে রাস্তায় উহার প্রতীকার করা সময়সাপেক্ষ, সেই রাস্তা পরামর্শ-সিদ্ধ নহে। ঐক্যবন্ধনের জন্য যাঁহারা বক্তৃতার দ্বারা প্রতিনিয়ত চীৎকার করিতেছেন, তাঁহাদিগের কার্য্য আমাদিগের মতে, গভীর চিন্তাপ্রসূত নহে। শুধু মুখের কথার দ্বারা একটি দেশের সমস্ত লোককে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত করা সম্ভবযোগ্য নহে। এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়, যাহাতে মুখে কোন কথা না কহিলেও একমাত্র কার্য্যের ফলেই মিলন অনায়াসসাধ্য ও অনিবার্য্য হয়। যাহা অনায়াসসাধ্য নহে, তাহা কখনও জনসাধারণ সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। ঐরূপ ব্যবস্থা না হইলে যে প্রকৃত মিলন সম্ভবযোগ্য হয় না, তাহার প্রমাণ স্বদেশী-যুগের নেতৃবর্গের ও গান্ধীজীর কার্য্য। তাঁহারা মিলনের উপকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতার কোন ত্রুটি করেন নাই, অথচ ভারতবাসীর মিলন হওয়া ত' দূরের কথা, দলাদলি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। কাযেই, যদিও দেশের দুঃখ দূর করিবার জন্য দেশবাসীর মিলন সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজনীয়, তথাপি উহার কথা আপাততঃ ছাড়িয়া দিয়া কোন্ কার্য্যে উহা অনায়াসসাধ্য হয়, সেই কার্য্যের অনুসন্ধান করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ—চারিশ্রেণীর লোক যাহাতে চারি রকমের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়,তাহার ব্যবস্থা আশুগ্রহণযোগ্য নহে। একে ত' ভারতবাসী সকলেই পরাধীনতা ও অজ্ঞানতাবশতঃ অস্বাভাবিকরূপে প্রায়শঃ একমাত্র পরমুখাপেক্ষী শ্রমজীবী চাকুরীয়া শূদ্রের জাতিতে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার উপর আবার মানুষ যে স্বভাবতঃ চারিশ্রেণীতে বিভক্ত, উহা পরিজ্ঞাত হওয়া এবং তদনুসারে কর্ম্মবিভাগ করা প্রকৃত বিজ্ঞানের জ্ঞানসাপেক্ষ। এতাদৃশ অবস্থায় মহামানুষের উদ্ভব না হইলে ঐ বিজ্ঞান পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে এবং মহামানুষের উদ্ভব হইলেও উহা সর্ব্বসাধারণকে শিখাইয়া কার্য্যে পরিণত করা সময়সাপেক্ষ। কাযেই, ভারতবাসী সকলের অর্থাভাব প্রভৃতি দূর করিবার জন্য যে দ্বিতীয় প্রয়োজন বিদ্যমান আছে, তাহার কথাও আপাততঃ ছাড়িয়া দিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ—যাহাতে চারিশ্রেণীর লোক মিলিত হইয়া কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিসাধনে অবহিত হয়, তাহার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা আশু সম্ভবযোগ্য কি না, তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, যতদিন পর্য্যন্ত প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রয়োজন সমাধান করিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত না হয়, অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবাসী সকলে ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ না হয়, যতদিন পর্য্যন্ত চারিশ্রেণীর মানুষ চারিরকমের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত হইয়া তাহা পালন করিতে অবহিত না হয় এবং যাহাতে নদী ও খাল প্রভৃতি প্রত্যেক জলাশয়ে সর্ব্বনিম্ন বালুকাস্তর পর্য্যন্ত বারমাস জল থাকে, তাহার ব্যবস্থা যতদিন পর্য্যন্ত সাধিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রকৃত উন্নতি সাধন করিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা সম্ভবযোগ্য নহে। কাযেই, ইহাও বর্ত্তমান অবস্থায় প্রয়োগযোগ্য নহে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

চতুর্থতঃ—প্রত্যেকে যাহাতে সাধ্যায়ত্তরূপে আত্ম-তত্ত্বসম্বন্ধীয় শিক্ষা লাভ করিয়া প্রকৃতভাবে চরিত্রবান্ হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা

অনতিবিলম্বে প্রবর্ত্তন করা সম্ভবযোগ্য কি না, তাহার বিচার করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, উহাও বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভবযোগ্য নহে। পেট যখন ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলিতে থাকে, রোগে ও শোকে মানুষের হৃদয় যখন ভাঙ্গিয়া পড়িতে আরম্ভ করে, তখন যে-পর্য্যন্ত ঐ ক্ষুধার জ্বালা, রুগ্নতা ও শোক-গ্রস্ততা নিবৃত্ত না হয়, সেই পর্য্যন্ত আর কোন-বিষয়ক কথা কর্ণ অথবা মস্তিষ্ক গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হয়, ইহা স্বাভাবিক সত্য।

পঞ্চমতঃ—ভারতবর্ষের নদী ও খাল প্রভৃতি প্রত্যেক জলাশয়ে যাহাতে সর্ব্বনিম্ন বালুকাস্তর পর্য্যন্ত বার মাস জল থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা আশু গ্রহণযোগ্য কি না, তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে কোন্ কার্য্যের দ্বারা উহা সাধিত হইতে পারে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, কোদাল ও ঝুড়ি লইয়া অথবা ড্রেজারের সাহায্যে নদী ও খালগুলি কাটিতে আরম্ভ করিলেই উহাদিগকে সুগভীর করিয়া তোলা সম্ভব হয় এবং তখন প্রত্যেক জলাশয়ে বারমাস জলও থাকিতে পারে। এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক জলাশয়ে যাহাতে বারমাস জল থাকে, তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলেই জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি যাহাতে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়, তাহা করিতে হইলে নদী ও খাল প্রভৃতি প্রত্যেক জলাশয়ের জল যাহাতে সর্ব্বনিম্ন বালুকাস্তর পর্য্যন্ত সুগভীর ভাবে বারমাস বিদ্যমান থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়, কারণ মৃত্তিকার সর্ব্বনিম্ন বালুকাস্তরে নিছক বালি বিদ্যমান থাকে এবং তাহা ছাড়া অন্য স্তরে বালুকা থাকিলেও থাকিতে পারে বটে, কিন্তু উহা কখনও নিছক বালি হয় না। উহার সহিত সর্ব্বদাই অল্পাধিক পরিমাণে কর্দ্দম মিশ্রিত থাকে। কোন জলাশয়ের জল যখন নিছক বালুকাস্তর পর্য্যন্ত সুগভীর হয়, তখন ঐ জল পার্শ্ববর্ত্তী মৃত্তিকার মধ্যে বহুদূর পর্য্যন্ত

সম্পূর্ণ ভাবে প্রবিষ্ট হইতে পারে এবং উহা হইতে যে বাষ্পোদ্গম হয়, তাহাও সর্ব্বতোভাবে স্নিগ্ধ হয়। এইরূপে উহার দ্বারা দেশময় জমির সরসতা ও বায়ুর স্বাস্থ্য-প্রদতা রক্ষিত হয়। অন্য পক্ষে, কোন জলাশয়ে জল যদি নিছক বালুকাস্তর পর্য্যন্ত সুগভীর না হইয়া কর্দ্দমমিশ্রিত স্তর পর্য্যন্ত গভীর হয়, তাহা হইলে মিশ্রিত কর্দ্দমের পরিমাণের তারতম্যানুসারে, পার্শ্ববর্ত্তী জমির সরসতার এবং বায়ুর স্নিগ্ধতার তারতম্য ঘটিয়া থাকে। জলাশয়ের নিম্নস্তরে কর্দ্দমের পরিমাণ অধিক হইলে জমী সরস না হইয়া নীরস হইয়া পড়ে এবং তাহা হইতে পূতিগন্ধযুক্ত বাষ্পোদ্গম হয় ও উহা স্বাস্থ্যের উন্নতির সহায়ক না হইয়া স্বাস্থ্যবিনাশের সহায়ক হয়। বর্ত্তমানে ইরিগেশনের খালগুলি আমাদিগের এই কথার প্রমাণ।

কোদাল ও ঝুড়ি লইয়া অথবা ড্রেজারের সাহায্যে নদীগুলির সর্ব্বনিম্ন বালুকাস্তর পর্য্যন্ত খনন করা মানুষের পক্ষে কখনও সম্ভব হয় না।

যাঁহারা ঋষিগণের ভূতত্ত্ব ও জল-সেচনতত্ত্ব এবং পাশ্চাত্ত্যগণের আধুনিক ভূতত্ত্ব (Geology) ও জলসেচন-তত্ত্ব (Irrigation Engineering) সমানভাবে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, পাশ্চাত্ত্যগণের আধুনিক ভূতত্ত্ব ও জলসেচন-তত্ত্ব, ঐ নামের কলঙ্ক। উহাতে কোন প্রকৃত তত্ত্ব লিপিবদ্ধ নাই, পরন্তু উহা কতকগুলি ইন্দ্রিয়পরায়ণ গভীর-দৃষ্টিবিহীন মানুষের একদেশদর্শী পরীক্ষার অজ্ঞানতাময় কথায় পরিপূর্ণ। বালু নিছক অথবা কর্দ্দমাক্ত, তাহা কি করিয়া সর্ব্বতোভাবে পরীক্ষা করিতে হয়, তাহার তথ্য পর্য্যন্ত ঐ-ঐ-বিষয়ক আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা করিতে সক্ষম হন নাই। আপাতদৃষ্টিতে, আধুনিক ভূতত্ত্ববিদ্ ও জলসেচন-তত্ত্ববিদ্ অনেক অদ্ভুত কার্য্য সমাধান করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের প্রায় প্রত্যেক কার্য্যটিতে মানুষের উপকার অপেক্ষা অধিকতর মাত্রায়

অপকারই সাধিত হইতেছে। ইহার প্রমাণ, দেশের সর্ব্বসাধারণের বর্ত্তমান শারীরিক স্বাস্থ্যের অবস্থা এবং জমীর উৎপাদিকা শক্তি। জমীর স্বাভাবিক উৎপাদিকা-শক্তি-হ্রাস ও অকালমৃত্যুর হার-বৃদ্ধি যে সাধারণতঃ ভূতত্ত্ববিদ্ ও জল-সেচন-তত্ত্ববিদ্‌গণের কু-কার্য্যের ফল, তাহা অতি সহজেই প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে তাঁহারা যতই অদ্ভুতকর্ম্মা হউন না কেন, নদীর সর্ব্বনিম্ন বালুকাস্তর পর্য্যন্ত খনন করা আধুনিক বৈজ্ঞানিকের সর্ব্ববিধ যন্ত্রের ক্ষমতাতিরিক্ত, কারণ কোন মৃত্তিকার বালুকাভাগ যখন অর্দ্ধাতিরিক্ত হয়, তখন উহা মানুষের যন্ত্রের অভেদ্য হইয়া থাকে এবং উহা খনন করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত থাকে না। এতাদৃশ অভেদ্য বালুরাশি মৃত্তিকার মধ্যে বিদ্যমান আছে বলিয়াই মৃত্তিকার জলরক্ষণের ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায় এবং উহার জন্যই মৃত্তিকা হইতে প্রস্তরের উদ্ভব হইয়া থাকে। এই-বিষয়ক সমস্ত কথা বিবৃত করা এই সন্দর্ভে সম্ভবযোগ্য নহে।

নিছক বালুকাস্তর পর্য্যন্ত নদী খনন করা একমাত্র প্রকৃতির সাধ্যায়ত্ত। পর্ব্বত হইতে উদ্ভূত হইয়া স্রোতস্বিনী যখন সমতল ভূমিতে অবতীর্ণ হয়, তখন উহার বেগ ও গতি অপ্রতিহত থাকিলে বায়ুর সাহায্যে ঐ স্রোত ঘূর্ণীয়মান হইয়া থাকে এবং ঘূর্ণয়নের সাহায্যে আধুনিক স্ক্রুর মত উহা নিম্নগামী হয় এবং মৃত্তিকাস্থিত কর্দ্দমকে জলে পরিণত করিয়া উহার সমস্ত বাধা অতিক্রম করিতে সক্ষম হয়। এইরূপে বায়ুর সাহায্যে ঘূর্ণয়নের দ্বারা জলের অভেদ্য নিছক বালুকাস্তর পর্য্যন্ত স্রোতস্বিনী উপনীত হইয়া থাকে এবং নদী ঐ স্তর পর্য্যন্ত গভীর হয়। এই তথ্য বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকের অপরিজ্ঞাত বটে, কিন্তু ঘূর্ণয়নের এই প্রাকৃতিক সত্য বিদ্যমান আছে বলিয়াই ক্যাপষ্টানের (capstan) সাহায্যে ঘূর্ণয়নের দ্বারা স্ক্রুপাইলসমূহ (screw piles) নদীর গভীর তলদেশ পর্য্যন্ত অনুবিদ্ধ করা (driving) সম্ভব হইতেছে এবং মৃত্তিকার বালুভাগ কর্দ্দমভাগ অপেক্ষা অধিক হইলে যন্ত্রের

অভেদ্য হইয়া পড়ে। এই সত্যের বিদ্যমানতা বশতঃ ঐ স্ক্রুপাইলগুলি গভীরতরদেশে অনুবিদ্ধ করা সম্ভব হয় না।

দেশের প্রত্যেক নদীটি উপরোক্তভাবে সুগভীর হইলে প্রত্যেক খাল প্রভৃতি অপরাপর জলাশয়গুলিও স্বভাববশতঃই যথোপযুক্ত পরিমাণে সুগভীর হইয়া থাকে।

স্রোতস্বিনী যখন সমতল ভূমিতে অবতীর্ণ হয়, তখন উহার বেগ ও গতি অপ্রতিহত থাকিলে উহার স্রোত যেমন বায়ুর সাহায্যে ঘূর্ণীয়মান হইতে থাকে এবং উহা যেরূপ নিছক বালুকাস্তর পর্য্যন্ত উপনীত হইতে সক্ষম হয়, সেইরূপ আবার উহার বেগ ও গতি বাধা-প্রাপ্ত হইলে ঐ ঘূর্ণয়নও অসম্ভব হয় এবং তখন ঐ নদীও অগভীর হইয়া পড়ে।

দেশের কোন নদী অগভীর হইলে খাল ও অন্যান্য জলাশয়গুলিও অগভীর হইয়া থাকে।

কাযেই দেখা যাইতেছে যে, দেশের নদী ও খাল প্রভৃতি প্রত্যেক জলাশয়ে যাহাতে বারমাস সর্ব্বনিম্ন বালুকাস্তর পর্য্যন্ত জল থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে, সর্ব্বত্র স্রোতস্বিনীর বেগ ও গতি যাহাতে সর্ব্বরকমের বাধা হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

এই ব্যবস্থা অদূরভবিষ্যতে প্রবর্ত্তন করা সম্ভবযোগ্য কি না, তাহার বিচার করিতে বসিলে বর্ত্তমান সময়ে কোন্ কোন্ কারণে স্রোতস্বিনীর বেগ ও গতি বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহার সন্ধান করিতে হইবে।

কোন্ কোন্ কারণে স্রোতস্বিনীর বেগ ও গতি বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহার সর্ব্বপ্রধান কারণ চারিটি ; যথা, (১) রেল-রাস্তা, (২) মোটরগাড়ীর রাস্তা, (৩) পুলসমূহ, এবং (৪) আধুনিক বাণিজ্যপ্রধান সহরসমূহ।

এই চারিটি কারণে যে, স্রোতস্বিনীসমূহের স্বাভাবিক গতি

ও বেগ প্রতিনিয়ত বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহা একটু চক্ষু মেলিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। আধুনিক বাণিজ্যপ্রধান সহরসমূহ বাণিজ্যের সহায়তার জন্য নদীর তীরে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। তাহার যে কোনটীর অবস্থান পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, তাহার নদীর তীরস্থিত অংশ প্রায়শঃ প্রাচীন নদীর বক্ষে নির্ম্মিত হইয়াছে এবং উহার ফলে নদী যথেষ্ট পরিমাণে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে।

অনুসন্ধান করিলে আরও জানা যাইবে যে, নদীর স্বাভাবিক গতি ও বেগকে কোনরূপে বাধা প্রদান না করিয়া আধুনিক রেল-রাস্তা, অথবা মোটরগাড়ীর রাস্তা, অথবা পুলসমূহ, অথবা বাণিজ্যপ্রধান সহরসমূহ প্রয়োজন-সাধনানুরূপ ভাবে নির্ম্মাণ করা সম্ভব নহে।

কাযেই ইহা বলিতে হইবে যে, স্রোতস্বিনীর স্বাভাবিক বেগ যাহাতে কোনরূপে বাধাপ্রাপ্ত না হয়, তাহা করিতে হইলে, রেল-রাস্তা, মোটরগাড়ীর রাস্তা, পুলসমূহ এবং আধুনিক বাণিজ্যপ্রধান সহরসমূহ যাহাতে বিস্তৃতি লাভ করিতে না পারে এবং উহার মধ্যে যাহা যাহা এক্ষণে বিদ্যমান আছে, তাহার প্রত্যেকটি যাহাতে অপসারিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

মানুষ এক্ষণে যে সমস্ত অভ্যাসে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে প্রত্যেক রেল-রাস্তা, মোটরগাড়ীর রাস্তা, পুল এবং বাণিজ্যপ্রধান সহরের উচ্ছেদ সংঘটিত হইলে, কাহারও কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে কি না, তাহাও এই সঙ্গে বিচার করিতে হইবে।

ঐ বিচারে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, যাঁহারা রেল-রাস্তা প্রভৃতির মালিক, অথবা যাঁহারা উহার সংস্রবে থাকিয়া চাকুরী ও ব্যবসায় করিয়া লাভবান্ হইয়া থাকেন, আপাতদৃষ্টিতে তাঁহাদিগের কিছু আর্থিক অনিষ্ট ঘটিবে বটে, কিন্তু তদ্ব্যতীত অন্যান্য জনসাধারণের কোনই অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না। কারণ, যখন দেখা যাইতেছে যে, রেল-রাস্তা প্রভৃতির উচ্ছেদ সাধন করিলে নদীসমূহের

স্বাভাবিক বেগ ও গতি অপ্রতিহত থাকিতে পারে, তখন রেল ও মোটরের স্থানে অনায়াসেই সমান ভাবে জলযানসমূহের গমনাগমন সাধিত হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা মানুষের গমনাগমনের এবং পণ্যবহনের প্রয়োজনও সম্পন্ন হইতে পারে।

রেল-রাস্তা, মোটর গাড়ীর রাস্তা প্রভৃতির উচ্ছেদ সাধন করা কোনরূপ অতিরিক্ত খরচ, অথবা পরিশ্রম-সাধ্য কি না, তাহাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে। 'এই ভাবনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহা আদৌ অতিরিক্ত খরচ অথবা পরিশ্রমসাধ্য নহে, কারণ বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ উহাদের রক্ষায় যত্নপরবশ না হইলে, স্রোতস্বিনীসমূহ তাহাদের স্বাভাবিক বেগ ও গতির অপ্রতিহততাবশতঃ অনায়াসেই উহার প্রত্যেকটীকে সামান্য কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভাসাইয়া লইতে সক্ষম হয়।

সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষের নদী ও খাল প্রভৃতি প্রত্যেক জলাশয়ে যাহাতে বারমাস সর্ব্বনিম্ন বালুকাস্তর পর্য্যন্ত জল থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা অসাধ্য নহে এবং উহাতে কেবলমাত্র সামান্য কয়েকজন মালিক, ব্যবসায়ী ও চাকুরীয়া ছাড়া আর কাহারও কোনরূপ অসুবিধা ও ক্ষতিগ্রস্ততার আশঙ্কা নাই।

স্রোতস্বিনীসমূহের স্বাভাবিক বেগ ও গতি যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তজ্জন্য রেল-রাস্তা, মোটর-রাস্তা, পুলসমূহ এবং বাণিজ্যপ্রধান সহরসমূহ যাহাতে আর বিস্তৃতি লাভ করিতে না পারে এবং ঐ রেল-রাস্তা প্রভৃতি যাহা যাহা বিদ্যমান আছে, তাহা রক্ষা করিবার জন্য আর কোনরূপ প্রয়াস যাহাতে না করা হয়, তাহার দিকে লক্ষ্য করিলে, নদী ও খাল প্রভৃতি প্রত্যেক জলাশয়ে যাহাতে বারমাস সর্ব্বনিম্ন বালুকাস্তর পর্য্যন্ত জল থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু এই কার্য্যে কে হস্তক্ষেপ করিবে, তাহাই হইবে প্রথম সমস্যা। ইহা ছাড়া কোনরূপে ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিলে যাহারা

কার্য্যের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন, অর্থাৎ রেল-রাস্তা প্রভৃতির মালিকগণ, তৎ-সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী ও চাকুরীয়াগণ যে উহাতে স্বভাবতঃ বাধা প্রদান করিতে উদ্যত হইবেন, তাহাই বা অতিক্রম করা যাইবে কিরূপে, ইহা হইবে ঐ কার্য্যের দ্বিতীয় সমস্যা।

এই কার্য্য অসাধ্য না হইলেও উহা যে অতীব কষ্টসাধ্য, তাহা কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। ইহা যতই কষ্টসাধ্য হউক না কেন, এই কার্য্যে মানুষের একদিন না একদিন প্রবৃত্ত হইতেই হইবে, কারণ অন্য কোন উপায়ে অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং শান্তির অভাব হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নহে।

দেশের কোন্ শ্রেণীর মানুষের দ্বারা এই কার্য্য সম্ভবযোগ্য হইতে পারে, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, যাহারা ইহার দ্বারা আশু লাভবান্ হইবেন, তাঁহাদিগের পক্ষে ইহা গ্রহণ করা সম্ভব।

একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, নদী ও খাল প্রভৃতি প্রত্যেক জলাশয়ে যাহাতে বারমাস সর্ব্বনিম্ন বালুকাস্তর পর্য্যন্ত জল থাকে, তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভবান্ হইবেন যাঁহারা বর্ত্তমানে বিবিধ সম্পদের মালিক, ব্যবসায়ী ও চাকুরীয়াগণ। কারণ, আজকাল যাঁহারা বিবিধ সম্পদের মালিক, ব্যবসায়ী ও চাকুরীয়া, তাঁহারাই স্বভাবতঃ দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্। দেশের জন-সাধারণ যাহাতে সর্ব্বতোভাবে অর্থাভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলে, ইহাঁরাই পরিশেষে জন-সাধারণের পরিচালক হইতে পারিবেন এবং তখন ইহাঁদিগকে কখনও লাভ-লোকসানের কথা, অথবা নফরগিরীর চিন্তাজ্বরে ব্যাকুল হইয়া অকালে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া জীবনসুখে বঞ্চিত হইতে হইবে না। ইহাঁরা পরিশেষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভবান্ হইবেন বটে, কিন্তু আশু ইহাঁদের কোন লাভ হইবে না, পরন্তু ইহাঁদের প্রত্যেককে কার্য্যের প্রারম্ভে অল্পাধিক অসুবিধা ভোগ

করিতে হইবে। ইহাঁরা অধুনা জীবনব্যাপী যে যে অশান্তি ও অস্বাস্থ্য ভোগ করিয়া থাকেন, তলাইয়া চিন্তা করিলে তাহার তুলনায় ঐ অসুবিধা নগণ্য। তথাপি ইহাঁদের ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার সম্ভাবনা খুবই অল্প, কারণ ইহাঁরা প্রায়শঃ সঙ্কীর্ণ স্বার্থসাধনে মত্ত এবং যে দূরদর্শিতা থাকিলে কোন কার্য্যের পূর্ব্বাপর আমূলভাবে চিন্তা করা সম্ভব, কু-শিক্ষার প্রভাবে ইহাঁদিগের সেই দূরদর্শিতা প্রায়শঃ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। অথচ, যাঁহারা জীবন-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ভূয়োদর্শন ও অভিজ্ঞতা-লাভে কথঞ্চিৎ পরিমাণেও কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহাদিগের কাহারও নেতৃত্ব না হইলে সর্ব্বসাধারণের হিতকর কোন কার্য্যে সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয় না। আমাদের মনে হয়, যাঁহারা এই কার্য্যে আশু লাভবান্ হইবেন, তাঁহারা ইহাতে আন্তরিকতার সহিত সদ্ভাবে প্রবৃত্ত হইলে, স্বভাবের নিয়ম-বশে উহাঁদের কাহারও না কাহারও নেতৃত্ব পাওয়া যাইবে।

কাহাঁরা এই কার্য্যের দ্বারা আশু লাভবান্ হইবেন, তাহার কথা চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, যাঁহারা কৃষক, জমীদারী ও জোতদারী প্রভৃতি কৃষি-ব্যবসায়ী, কুটীর-শিল্পী ও শিক্ষিত বেকার, তাঁহাদিগের ইহাতে কোনরূপের ক্ষতিগ্রস্ততার আশঙ্কা নাই। পরন্তু, নদী ও খাল প্রভৃতি প্রত্যেক জলাশয়ে যাহাতে বারমাস সর্ব্বনিম্ন বালুকাস্তর পর্য্যন্ত জল থাকে, তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলে, অনতিবিলম্বে জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পাইবে এবং কৃষি-কার্য্যে ও কুটীর-শিল্পে অনায়াসে লাভবান্ হওয়া সম্ভব হইবে। তখন কৃষক, কৃষি-ব্যবসায়ী ও কুটীর-শিল্পি-গণের অর্থাভাব ঘুচিয়া যাইবে এবং শিক্ষিত বেকারগণও কৃষি-ব্যবসা আরম্ভ করিয়া তাঁহাদিগের দুর্দ্দশার মোচন সাধন করিতে পারিবেন।

কাযেই ইহা বলিতে হয় যে, এই কার্য্যের প্রথম প্রবৃত্তি দেশের কৃষক, কৃষি-ব্যবসায়ী, কুটীর-শিল্পী ও শিক্ষিত বেকারগণের দ্বারা সম্ভব।

কিরূপভাবে এই কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে, তাহার কথা চিন্তা,

করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, কংগ্রেসের সাহায্য ব্যতীত ইহা সম্ভব নহে। সর্ব্বসাধারণের কোন হিতকর কার্য্য কিরূপভাবে আরম্ভ করিতে হইবে, তাহার কথা চিন্তা করিতে বসিলে সর্ব্বাগ্রে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কাহারও সহিত কোনরূপে দ্বন্দ্ব ও কলহে প্রবৃত্ত হইলে সর্ব্বসাধারণের কোন হিতকর কার্য্যে সাফল্য লাভ করা কখনও সম্ভব নহে। যাঁহারা ধূর্ত্ত, অথবা শঠ, অথবা অজ্ঞ, তাঁহারা যাহাতে তাঁহাদের ধূর্ত্ততা, শঠতা এবং অজ্ঞতা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন, তাহার উপায় আবিষ্কার করিবার প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু তথাপি তাঁহাদিগের সহিত যাহাতে কোনরূপ দ্বন্দ্ব অথবা কলহে প্রবৃত্ত হইতে না হয়, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হয়। কংগ্রেসের সাহায্য ব্যতীত এতাদৃশ কার্য্য সম্ভবযোগ্য নহে বটে, কিন্তু যাঁহারা বর্ত্তমানে কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের নেতৃত্ব বজায় থাকিলে ঐ কংগ্রেসের দ্বারা যাহা প্রকৃতপক্ষে সাধারণের হিতকর কার্য্য, তাহা সম্পাদন করা কখনও সম্ভব হইবে না। আমরা এই কথা কেন বলিতেছি, তাহার কৈফিয়ৎ দিতে হইলে, আমাদিগের পাঠকবর্গকে আর একবার স্মরণ করিতে হইবে যে, কাহারও সহিত কোনরূপ দ্বন্দ্ব ও কলহে প্রবৃত্ত হইলে, সর্ব্বসাধারণের কোন হিতকর কার্য্যে কোনরূপ সাফল্য লাভ করা কখনও সম্ভব হয় না। এই সত্যটিকে তাঁহাদিগকে ব্যক্তিগত জীবনের সহিত মিলাইয়া সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে। এই সত্যটি সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, দ্বন্দ্ব ও কলহের দ্বারা কেহ কখনও কিঞ্চিৎ পরিমাণেও সাফল্য লাভ করিতে পারে না বটে, কিন্তু কংগ্রেসের বর্ত্তমান নেতৃবর্গের মূল কার্য্য সর্ব্বসাধারণকে দ্বন্দ্ব ও কলহে প্রমত্ত করিয়া তোলা। ইংরাজকে বিতাড়িত করিয়া স্বাধীনতা লাভ করা তাঁহারা কংগ্রেসের মূলমন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার পর আবার বিপক্ষকে পরাজিত করিয়া কাউন্সিলে সংখ্যাধিক্য লাভ করা তাঁহাদিগের অপর মন্ত্র হইয়া

দাঁড়াইয়াছে। দ্বন্দ্ব ও কলহের প্রবৃত্তিবিহীন কিছুই ইহাঁদের কথায় অথবা কার্য্যে প্রচার লাভ করে না। কেন ইহাঁরা এইরূপ হইয়াছেন, তাহার কথা চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, এতাদৃশ হীন প্রবৃত্তির সর্ব্বপ্রধান কারণ পাশ্চাত্ত্য কুশিক্ষা। ইহাঁরা মুখে স্বদেশীয়তার কথা বলেন বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ ইহাঁদের প্রত্যেক কার্য্য হীন পাশ্চাত্ত্যের পরিচায়ক। গান্ধীজী হইতে আরম্ভ করিয়া যাঁহারা বর্ত্তমানে নেতৃত্বের সম্মুখভাগে সমাসীন রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের একজনকেও ধূর্ত্ততা, শঠতা এবং অজ্ঞতা হইতে মুক্ত বলিয়া মনে করিবার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে, ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ মালিক, ব্যবসায়ী ও চাকুরীয়াগণের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের সহিত সংশ্লিষ্ট, আর কেহ কেহ কংগ্রেসের কার্য্যের দ্বারা নিজ নিজ জীবিকার্জ্জনের কার্য্যে ব্যাপৃত। গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্রকে পর্য্যন্ত এতাদৃশ কোন না কোন দোষ হইতে কথঞ্চিৎ পরিমাণেও মুক্ত বলিয়া মনে করা চলে না।

কাজেই কি করিয়া ইহাঁদিগের সহিত কোনরূপ দ্বন্দ্ব-কলহে প্রবৃত্ত না হইয়া জাতীয় কংগ্রেসকে ইহাঁদিগের অবৈধ নেতৃত্ব হইতে মুক্ত করা যায়, তাহাই হইবে উপরোক্ত কার্য্যবিধির প্রথম আলোচ্য।

ইহাঁদিগের প্রতিনিধিবর্গ যখন ইহাদিগের জন্য কোন না কোনরূপ ভোটসংগ্রহের কার্য্যে কৃষক, কৃষি-ব্যবসায়ী, কুটীর-শিল্পী ও বেকার যুবকগণের সম্মুখীন হন, তখন, কি করিয়া ভারতবর্ষের পরাধীন অবস্থাতেও ভারতবাসিগণের প্রত্যেকের অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব বিদূরিত হইতে পারে, তাহার পরিকল্পনা তাঁহাদিগের নিকটে যাচ্ঞা করিলে, ইহাঁদিগের অবৈধ নেতৃত্বের অবসান ঘটিতে পারে।

ভোটের জন্য যাঁহারা ইহাঁদিগের প্রতিনিধিত্ব করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ পাইলে, অথবা এই নেতৃবর্গের স্বয়ং কেহ জনসাধারণের সম্মুখীন হইলে, কৃষক, কৃষি-ব্যবসায়ী, কুটীর-শিল্পী ও বেকার যুবকগণকে সসম্ভ্রমে বলিতে হইবে যে,—

"হে মহাশয়, ভোট আমরা কংগ্রেসের প্রতিনিধিকে দিব, কিন্তু যাঁহাকে আমরা আমাদিগের প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচন করিতে চাহি, তাঁহার নিকট হইতে, কি করিয়া আমাদিগের এই পরাধীন অবস্থাতেও অর্থাভাব এবং স্বাস্থ্যাভাব বিদূরিত হইতে পারে তাহার প্রয়োগ-যোগ্য পরিকল্পনা আমরা যাচ্ঞা করিতেছি। স্বাধীন না হইলে আমা-দিগের ঐ অভাব দূর হইবে না, ইহা আর আমরা শুনিতে পারি-তেছি না। কবে নয় মণ তেল পুড়িবে আর রাধা নাচিবে, তাহার জন্য অপেক্ষা করিবার ধৈর্য্য আর আমাদিগের নাই। পেটের দায়ে আমরা আর অহিংস থাকিতে পারিতেছি না। আমাদের আর ঐ অহিংসার বাণ্য শুনিবার ধীরতা নাই। শিক্ষা লাভ করিবার মত মস্তিষ্ক আমাদিগের নাই। উহা আমরা চাহি না। আমরা চাই সসম্ভ্রমে পেটের ভাত। গভর্ণমেণ্টের ঋণ ও খয়রাতকে আমরা অসম্ভ্রমের চিহ্ন বলিয়া মনে করি। যাহাতে উহা আর না লইয়া চলিতে পারি, তাহার উপায় আমরা চাই। হাসপাতাল আমাদিগের অনেক হইয়াছে; ডাক্তারও আমরা অনেক পাইয়াছি। আমাদিগের অসুস্থতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। যাহাতে আমাদিগের আর এতাদৃশ ভাবে অসুস্থ না হইতে হয়, তাহা আমরা এক্ষণে চাহি।"

উপরোক্ত যাচ্ঞা যাহাতে পরিপূর্ণ করা হয়, কৃষক প্রভৃতি ব্যক্তিগত ভাবে তদ্বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হইলে, বর্ত্তমান নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকেই অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন। আর, কেহ কেহ হয়ত ঐ যাচ্ঞার পূরণ কি করিয়া হইতে পারে, তাহার সন্ধানে ব্যাপৃত হইবেন। যদি ইহাঁদিগের কেহই এই কার্য্যে ব্যাপৃত না-ও হন, তাহা হইলেও দেখা যাইবে যে, স্বভাবের নিয়মানুসারে জনসাধারণের একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু-লাভের আন্তরিক যাচ্ঞা পূরণ করিবার জন্য, যাঁহারা অজ্ঞাত, তাঁহাদিগের মধ্য হইতেই উপযুক্ত গুণসম্পন্ন লোক অবতীর্ণ হইবেন। এইরূপে, জাতীয় কংগ্রেস্ পরিচালনার জন্য

যাঁহারা অনুপযুক্ত, তাঁহাদিগকে অপসারিত করিয়া, প্রকৃত গুণসম্পন্ন নেতৃবর্গের উদ্ভব সম্পাদন করা সম্ভবযোগ্য হইবে।

পাঠকবর্গকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহা আমাদিগের মত নহে। ইহা ভারতের এতাদৃশ অবস্থায় ভারতীয় ঋষির নির্দ্দিষ্ট কার্য্যসূত্র। যাঁহারা এই কার্য্যসূত্রের বিরোধী,তাঁহারা যাহাই বলুন না কেন, গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্রের মত দ্বন্দ্ব-কলহপ্রিয়, ধূর্ত্ত, শঠ, সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরায়ণ নেতৃবর্গের প্রাধান্য যতদিন পর্য্যন্ত বিদূরিত না হয়, অথবা যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা তাঁহাদিগের দ্বন্দ্বকলহ-প্রিয়তা, ধূর্ত্ততা, শঠতা, সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরায়ণতা পরিহার করিতে বাধ্য না হন, ততদিন পর্য্যন্ত কংগ্রেস কখনও জাতীয়তার রূপ ধারণ করিতে পারিবে না এবং ততদিন পর্য্যন্ত কোন ক্রমেই ভারতবাসী জনসাধারণ তাহাদিগের বুভুক্ষু অবস্থা হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না। অদূরভবিষ্যৎ আমাদিগের এই কথার সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

এইরূপে যথোপযুক্ত গুণসম্পন্ন লোকের দ্বারা কংগ্রেস অধিকৃত হইলে, কার্য্যসূত্রে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব হইবে বটে, কিন্তু তখনও রেল-রাস্তা, মোটর-গাড়ীর রাস্তা, পুলসমূহ ও বাণিজ্য-প্রধান সহরসমূহের অপসারণ করিয়া স্রোতস্বিনীসমূহের গতি ও বেগ যাহাতে অপ্রতিহত থাকে, তাহা করা সহজসাধ্য হইবে না, কারণ তখনও সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য উহাতে বাধা প্রদান করিবেন সম্পদের মালিকসমূহ, তৎসংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী ও চাকুরীয়াগণ। ইহাঁদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করা অধিকতর ক্লেশসাধ্য ব্যাপার। ইহাঁরা যেরূপ ক্ষমতাপন্ন, তাহাতে অতীব সতর্কতার সহিত পরিচালিত না হইলে, যাহাঁরা সম্পদের মালিক, অথবা ব্যবসায়ী, অথবা চাকুরীয়া নহেন, তাঁহাদিগের পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরায়ণ হইবার আশঙ্কা বিদ্যমান থাকিবে। এইরূপ অবস্থার উদ্ভব যাহাতে না হয়, তজ্জন্য কংগ্রেসকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যাঁহারা কংগ্রেসের বিরোধী, তাঁহারা মানুষ এবং তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই ভারতবাসী। এই সময়ে যাঁহারা কংগ্রেসের প্রকৃত নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন,

তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা নাম ও যশের অবস্থার অন্তরালে থাকিয়া প্রভুত্বের কার্য্য ও ভাব হইতে বিরত থাকিতে হইবে এবং গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রিত্ব প্রভৃতি উচ্চপদ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। মুসলমান হউন, খৃষ্টান হউন, অথবা হিন্দু হউন, যাঁহারা কংগ্রেসের বিরোধী, তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা দলপতি, তাঁহারা যাহাতে মন্ত্রিত্ব প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদ পাইতে পারেন, তাহার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। কাহাকেও 'বাবা'র মত সম্মান করিলে সে কখনও 'শালা' বলিয়া অত্যাচার করিতে পারে না। স্বভাবের এই নিয়ম অনুসারে যাঁহারা কংগ্রেসের বিরোধী, তাঁহারা তখন আন্তরিকতার সহিত না হইলেও কার্য্যতঃ কংগ্রেসের পক্ষ সমর্থন করিতে বাধ্য হইবেন। এইরূপে তখন হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান-নির্ব্বিশেষে দেশের অধিকাংশ মানুষেরই কংগ্রেসের পতাকাতলে ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ হইবার সম্ভাবনা ঘটিবে। তখন একদিকে রেলরাস্তা প্রভৃতি অপসারণের ফলে যে সমস্ত মালিক, ব্যবসায়ী ও চাকুরীয়াগণ আপাতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন, তাঁহাদের ক্ষতিপূরণের যাহাতে বন্দোবস্ত হয়, তাহার ব্যবস্থার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে, অন্যদিকে ব্রিটিশারগণকে করযোড়ে বলিতে হইবে যে,—

> "হে মহাশয়গণ, আপনারা আমাদিগের প্রভু, আমরা স্বাধীনতার জন্য উদ্‌গ্রীব নহি। আমরা আমাদিগের যথাসর্ব্বস্ব আপনাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া আপনাদিগের আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত আছি। আমরা চাই শুধু পেটের ভাত ও রুটী, পরণের ধুতি ও চাদর, শয়নের কুটীর। আমরা অনশনে, অর্দ্ধাশনে, নগ্নাবস্থায়, অর্দ্ধনগ্নাবস্থায় ধৈর্য্যহারা হইয়াছি। আমরা কমিশন ও কমিটী চাই না। আমরা চাই পেটের ভাত এবং আপনাদের আদেশ। আমাদের যে জমিতে তিনশত বৎসর আগেও ২০ মণ ফসল হইত, সেই জমিতে এক্ষণে ৩।০ মণ ফসল হইতেছে। অনশন ও অর্দ্ধাশনবশতঃ আমরা আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিতেছি

না। অনশন ও অর্দ্ধাশন হইতে আমরা যাহাতে অনতিবিলম্বে মুক্ত হইতে পারি, হয় আপনারা নিজেরা তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিন, নতুবা আমরা যে ব্যবস্থা সাধন করিতে চাই, সেই ব্যবস্থা আপনারা সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন করুন।"

সমস্ত প্রদেশের মন্ত্রিগণের সহযোগে, নাম ও যশের অনভিলাষী সঙ্কীর্ণ-স্বার্থত্যাগী কংগ্রেসের নেতৃবর্গের দ্বারা এতাদৃশ যাচ্ঞা উত্থাপিত হইলে বৃটিশারগণের পক্ষে ইহার পূরণ করিয়া না থাকা অসাধ্য হইয়া পড়িবে। এতাদৃশ যাচ্ঞা উত্থাপিত হইলে দেশের জনসাধারণের এতদ্বিষয়ে স্বতঃই ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ হওয়া অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে। তখন 'মিলিত হও, মিলিত হও' বলিয়া চীৎকার করিতে হইবে না এবং বৃটিশারগণকে সর্ব্বতোভাবে প্রভু বলিয়া মানিয়া লইলে স্বভাবের নিয়মানুসারে তাঁহাদিগের পক্ষে কোন কৌশলে এই মিলনের বিরুদ্ধে বাধা উপস্থিত করিয়া সাফল্য লাভ করিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। কোন মানুষ যাহাকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া সজ্ঞানে আত্মত্যাগ করে এবং কেবলমাত্র জীবনধারণোপযোগী খাদ্যের ও ব্যবহার্য্যের প্রার্থী হয়, তখন তাহাকে বিমুখ করা পশুজনোচিত হয়। বৃটিশারগণ একে ত' এত অধিক পশুভাবাপন্ন নহেন, তাহার পর আবার তাঁহারা পশুভাবাপন্ন হইলেও, ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ ভারতবাসীর পক্ষে কয়েকটী পশুকে শাসন করা ক্লেশসাধ্য ব্যাপার হইতে পারে না।

তলাইয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, উপরোক্ত অবস্থার উদ্ভব হইলে ভারতবাসীর প্রকৃত রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা করতলগত হইবে এবং তখন নদী ও খাল প্রভৃতি প্রত্যেক জলাশয়ে যাহাতে বার মাস সর্ব্বনিম্ন বালুকাস্তর পর্য্যন্ত জল থাকে, তাহার ব্যবস্থা সাধন করা অনায়াসসাধ্য হইবে।

নদী ও খাল প্রভৃতি প্রত্যেক জলাশয়ে যাহাতে বার মাস সর্ব্বনিম্ন বালুকাস্তর পর্য্যন্ত জল থাকে, তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলে, কৃষি, শিল্প

ও বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতি সাধন করিয়া মুসলমান, খৃষ্টান ও হিন্দুনির্ব্বিশেষে সকল জনসাধারণের অর্থাভাব দূর করা যে সহজসাধ্য, তাহা আমরা আগেই দেখাইয়াছি। জনসাধারণের অর্থাভাব দূর করিতে পারিলে, শিক্ষা ও শৃঙ্খলা সংস্থাপনের দ্বারা অস্বাস্থ্য ও অশান্তি দূর করা অনায়াসসাধ্য হইবে। এই সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার আছে। যথাসময়ে আমরা আবার উহার আলোচনা করিব।

পাঠকদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবাসিগণের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য দেশের নদী ও খাল প্রভৃতি প্রত্যেক জলাশয়ে যাহাতে বার মাস সর্ব্বনিম্ন বালুকাস্তর পর্য্যন্ত জল থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা। উহা করা অনায়াসসাধ্য না হইলেও অসাধ্য নহে।

এই কার্য্যের দ্বারা যে শুধু ভারতবাসিগণ উপকৃত হইবেন, তাহা নহে। ভারতবর্ষের জনসাধারণের প্রত্যেকের অর্থাভাব যাহাতে বিদূরিত হইতে পারে, তাহা করিতে পারিলে মানব-সমাজের প্রত্যেকের অর্থাভাব দূর করা সম্ভব হইবে।

ভারতবাসী নেতৃবর্গকে যদিও কার্য্যতঃ ভারতবর্ষের সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য সর্ব্বাগ্রে আগুয়ান হইতে হইবে, তথাপি কি করিয়া সমগ্র মানব-সমাজের হিত সাধিত হইতে পারে, মনে মনে তাহার চিন্তা সর্ব্বদা জাগ্রত রাখিতে হইবে। তাঁহাদিগকে আরও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতবাসীই হউক, আর বিদেশীই হউক, যে কার্য্যে এক জনেরও মূলতঃ অনিষ্ট হইতে পারে, সেই কার্য্যে কোন ভারতবাসীর কোনরূপ প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবে না।

গান্ধীজী ও তাঁহার অনুসরণকারিগণ এই মৌলিক সত্যটি উপলব্ধি করিতে পারেন না বলিয়াই তাঁহাদিগের নেতৃত্বের ফলে আমাদিগকে এত বিব্রত হইতে হইতেছে।

গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য

সমগ্র জগতের মানব-সমাজের প্রায় প্রত্যেকেই আজকাল অর্থাভাবে, অথবা স্বাস্থ্যাভাবে, অথবা মনের অশান্তিতে ও অসন্তুষ্টিতে জর্জ্জরিত।

মানুষের চিরদিনই এই অবস্থা বিদ্যমান ছিল, অথবা কোন দিন মানুষের অবস্থা ইহা অপেক্ষা ভাল ছিল, তাহা দেখাইবার জন্য মানুষের অবস্থার অতীত ইতিহাসের মূল কথাগুলি নূতন করিয়া লেখা হইয়াছে। তাহাতে দেখান হইয়াছে যে বর্ত্তমান কালে পাশ্চাত্ত্যগণ প্রাচীন ইতিহাসের নামে যে কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা প্রায়শঃ বিশ্বাসযোগ্য নহে। কারণ তাঁহাদিগের রচিত ইতিহাসের উপকরণ বুদ্ধিমানোচিত নহে। কি হইলে স্মরণাতীত কালের ইতিহাস বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে তাহা এই গ্রন্থে দেখান হইয়াছে।

এই গ্রন্থের উপরোক্ত ইতিহাসানুসারে সর্ব্বজগতে বর্ত্তমান কাল হইতে বার হাজার বৎসর আগে হইতে আরম্ভ করিয়া তৎপরবর্ত্তী তিন হাজার বৎসর পর্য্যন্ত সমগ্র জগতের মানব-সমাজের প্রায় প্রত্যেক মানুষটির অর্থ বিষয়ে, স্বাস্থ্য বিষয়ে এবং মানসিক বিষয়ে সম্পূর্ণ সন্তুষ্টি বিদ্যমান ছিল। কোন্ কোন্ উপকরণের উপর নির্ভর করিয়া ঐ মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা সম্ভবযোগ্য বিস্তৃতভাবে এই গ্রন্থে দেখান হইয়াছে।

মানব-সমাজের পতন আরম্ভ হইয়াছে গত নয় হাজার বৎসর হইতে এবং তৎপরবর্ত্তী ছয় হাজার বৎসর পর্য্যন্ত সমগ্র

মানব-সমাজের প্রায় প্রত্যেকেই অবস্থার পুনরুন্নতি সম্বন্ধে একরূপ নিশ্চেষ্ট ছিলেন। এই ছয় হাজার বৎসর ধরিয়া মানুষ ক্রমেই অবনত হইতে আরম্ভ করিয়াছে বটে এবং তাহার পুনরুন্নতি সম্বন্ধে উদাসীনও হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও এখনকার মত পতন সম্পূর্ণ হয় নাই।

পতনের সম্পূর্ণতা আরম্ভ হইয়াছে গত তিন হাজার বৎসর হইতে এবং ঐ পতন সম্যক্‌ভাবে লতা-পাতা-পরিশোভিত হইয়াছে গত দুই শত বৎসর হইতে। আমাদিগের এই মত-বাদ আধুনিক সভ্যতাবাদী মানুষগুলির কথার সম্পূর্ণ বিরোধী। যে যুক্তির উপর আমাদিগের বিরুদ্ধ কথাগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাও এই গ্রন্থে দেখান হইয়াছে।

আমাদিগের নূতন মতবাদসমূহের যুক্তি সকলেই একবাক্যে সমীচীন বলিয়া স্বীকার করুন আর নাই করুন, সর্ব্বসাধারণের প্রত্যেকের অবস্থা যে অসহনীয় হইয়া উঠিতেছে, তাহা কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

কোন্ পরিকল্পনায় বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াও আবার প্রত্যেক মানুষটির অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অসন্তুষ্টি ও অশান্তি সম্যক্‌ভাবে বিদূরিত হইতে পারে, তাহার বিচারও এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে প্রয়োজনীয় ভাবে দেখান হইয়াছে।

তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সর্ব্বসাধারণের অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অসন্তুষ্টি ও অশান্তি সর্ব্বতোভাবে দূর করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে যাহাতে অর্থাভাব কথঞ্চিৎ পরিমাণে বিদূরিত হয়, তাহার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে এবং তাহা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে

জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি ও কুটীর-শিল্প যাহাতে বৃদ্ধি পায় ও লাভজনক হয়, তাহার আয়োজন করিতে হইবে।

জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি ও কুটীর-শিল্প যাহাতে বৃদ্ধি পায় ও লাভজনক হয়, তাহা করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে দেশের নদী ও খালের সর্ব্বত্র যাহাতে বারমাস সর্ব্বনিম্ন বালুকাস্তর পর্য্যন্ত জল থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেশের নদী ও খালের সর্ব্বত্র যাহাতে বারমাস সর্ব্বনিম্ন বালুকাস্তর পর্য্যন্ত জল থাকে, তাহা না করিতে পারিলে অন্য কোন উপায়ের দ্বারা সর্ব্বসাধারণের অর্থাভাব দূর করা সম্ভব হইবে না, তাহাও এই গ্রন্থে দেখান হইয়াছে।

দেশের নদী ও খালের উপরোক্ত অবস্থা সাধন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু উহা সহজসাধ্য নহে। উহার জন্য প্রয়োজন শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকল সম্প্রদায়ের মিলন এবং শিক্ষিতগণের নেতৃত্ব। অনেক কার্য্যেই শিক্ষিতগণের নেতৃত্ব পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এই কার্য্যে তাঁহাদিগের নেতৃত্ব প্রথমেই পাওয়া যাইবে না, কারণ এই কার্য্য আপাতভাবে অনেক শিক্ষিতেরই স্বার্থ-বিরুদ্ধ। এমন কি, কংগ্রেসের মধ্যে যে শিক্ষিতগণ কার্য্য করিতেছেন তাঁহাদিগের নেতৃত্বও এই কার্য্যের প্রারম্ভে পাওয়া সম্ভব হইবে না। এতদবস্থায় অশিক্ষিত জনসাধারণেরও সর্ব্বতোভাবে মিলিত হওয়া সম্ভব নহে। অথচ অর্থাভাব যেরূপ অসহ্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে উহা কথঞ্চিৎ দূরীভূত না হইলে, সর্ব্বসাধারণের দিনাতিপাত করা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে, কাযেই যিনি যেখানে যেরূপভাবে পারুন,

সেইখানে সেইরূপভাবে কংগ্রেসী ভদ্রমহোদয়গণের নিকট বিনীত-ভাবে প্রত্যেককে নিম্নলিখিত প্রার্থনাটি উত্থাপিত করিতে হইবে:—

"হে মহাশয়, ভোট আমরা কংগ্রেসের প্রতিনিধিকে দিব, কিন্তু যাঁহাকে আমরা আমাদিগের প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচন করিতে চাই, তাঁহার নিকট হইতে কি করিয়া আমাদিগের এই পরাধীন অবস্থাতেও অর্থাভাব এবং স্বাস্থ্যাভাব বিদূরিত হইতে পারে, তাহার প্রয়োগযোগ্য পরিকল্পনা আমরা যাচ্ঞা করিতেছি। স্বাধীন না হইলে আমাদিগের ঐ অভাব দূর হইবে না, ইহা আর আমরা শুনিতে পারিতেছি না। কবে নয় মণ তেল পুড়িবে আর রাধা নাচিবে, তাহার জন্য অপেক্ষা করিবার ধৈর্য্য আর আমাদিগের নাই। পেটের দায়ে আমরা আর অহিংস থাকিতে পারিতেছি না। আমাদের আর ঐ অহিংসার বাণী শুনিবার ধীরতা নাই। শিক্ষা লাভ করিবার মত মস্তিষ্ক আমাদিগের নাই। উহা আমরা চাই না। আমরা চাই সসম্ভ্রমে পেটের ভাত। গভর্ণমেণ্টের ঋণ ও খয়রাতকে আমরা অসম্ভ্রমের চিহ্ন বলিয়া মনে করি। যাহাতে উহা আর না লইয়া চলিতে পারি, তাহার উপায় আমরা চাই। হাসপাতাল আমাদিগের অনেক হইয়াছে; ডাক্তারও আমরা অনেক পাইয়াছি। কিন্তু আমাদিগের অসুস্থতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। যাহাতে আমাদিগের আর এতাদৃশ ভাবে অসুস্থ না হইতে হয়, তাহাই আমরা এক্ষণে চাই।"

এই যাচ্ঞার ফলে যে কিরূপভাবে সর্ব্বসাধারণের অর্থাভাব প্রভৃতি সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত হইতে পারে, তাহা এই গ্রন্থে দেখান হইয়াছে।